দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা



মানুষ জবাব দেবে হয় বুলেটে, নয় ব্যালটে
— পৃঃ ২৩

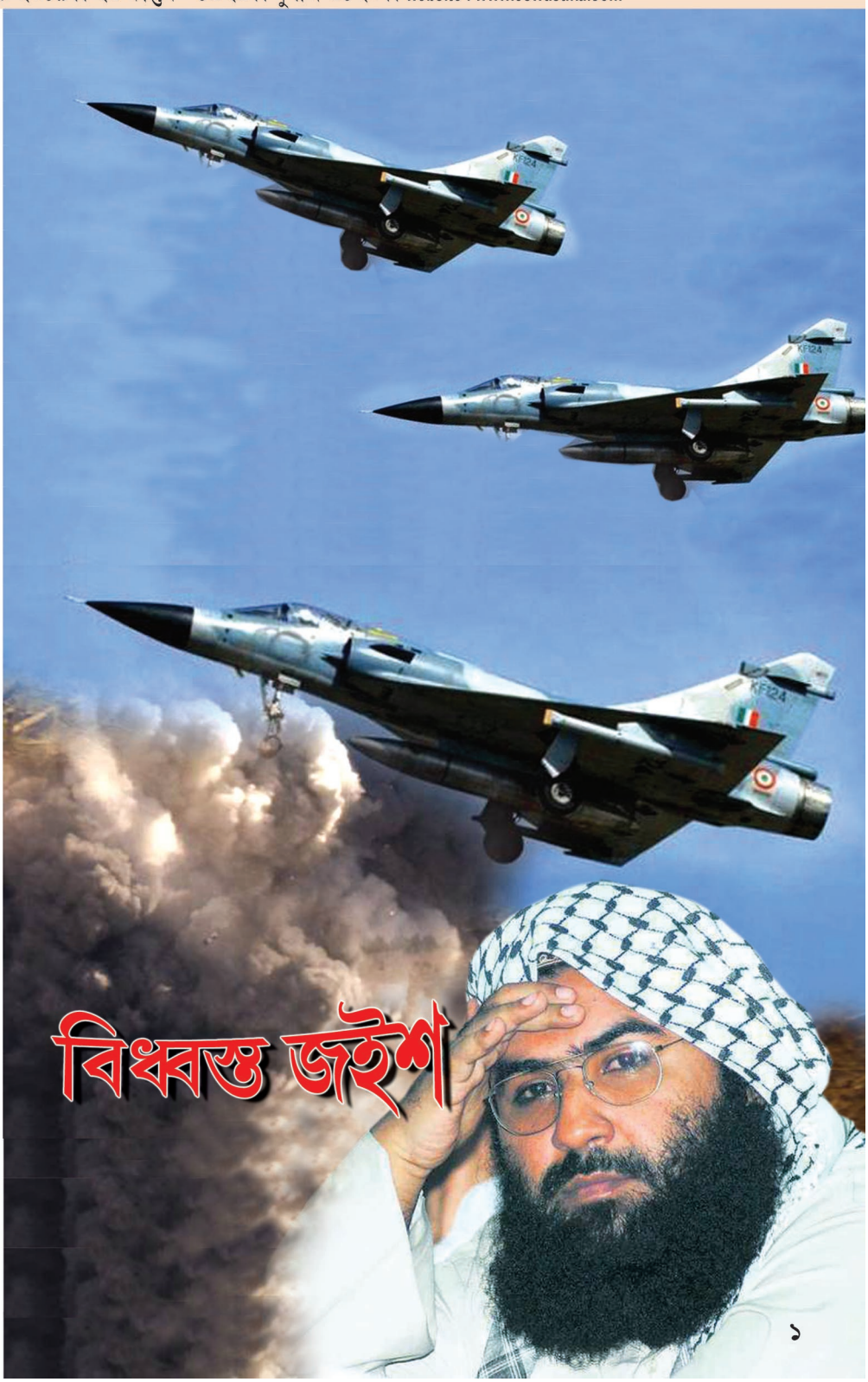
জীবনের মতো সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকাটা কি সমীচীন? —পৃঃ ১৭



৭১ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ১১ মার্চ ২০১৯।। ২৬ ফাল্গুন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



নায়ক অভিনন্দন



বিধ্বস্ত জইশ

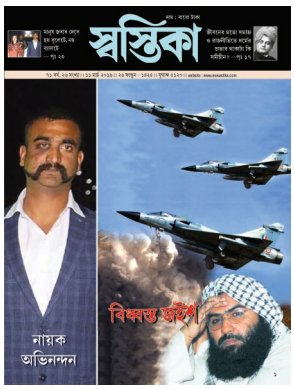
স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১১ মার্চ - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

যারা পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার কথা বলছে, তারা জ্ঞানপাপী ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ৬

খোলা চিঠি : ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গিয়ে বায়ুসেনার আঘাত চিরাচরিত বিদেশনীতির কৌশলগত পরিবর্তন ▯ নলিন মেহতা ▯ ৮

পাকিস্তানের শান্তির বুলি শুধুই লোকদেখানো ▯ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রাঃ) ▯ ১০

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক আবহের জন্য দায়ী মমতা নিজে ▯ সুকল্প চৌধুরী ▯ ১৩

অর্থনৈতিক যুদ্ধেও গোহারা পাকিস্তান ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৫

জীবনের মতোই সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকাটা কি সমীচীন? ▯ বরুণ দাস ▯ ১৭

হিন্দুরা পূর্বপাকিস্তানে যে তিমিরে ছিল বাংলাদেশেও সেই তিমিরেই ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ২০

ভারতীয়ত্ব প্রশ্নের মুখে— মানুষ জবাব দেবে হয় বুলেটে, নয় ব্যালটে ▯ সনাতন রায় ▯ ২৩

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে মোদীর রাজনৈতিক সদিচ্ছার জয় ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৭

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধি গদ্যকাব্য দশকুমার চরিত ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

সার্ধশতবর্ষে মহেশচন্দ্র ঘোষ ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩২

দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

গল্প : এত্তা জঞ্জাল ▯ পার্থসারথি গুহ ▯ ৩৫

গল্প : ঝড়ের পর ▯ প্রদীপ মারিক ▯ ৩৭

জাতীয় সংহতির মূল কথা ভূমির সঙ্গে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক ▯ স্বপন নাগ ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০** ▯ **চিত্রকথা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **উবাচ : ৪৫** ▯ **স্মরণে : ৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৮ মার্চ
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

দোল সাহিত্য সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
১৮ মার্চ
২০১৯

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল। দোল উৎসবে বন্ধনমুক্তির আনন্দ এবং ভাব-সম্মিলনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য পঙক্তিটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে দোল মানে রং আর আবিরে রঙিন হয়ে ওঠার দিন। জীবনের সব বিবর্ণতা রাঙিয়ে দেওয়ার দিন। এই দিন রাধাকৃষ্ণের প্রেম চরিতার্থতা অর্জন করে। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে এমনই এক দোলের দিন নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। স্বস্তিকায় আগামী সংখ্যায় থাকবে রং, রূপ এবং রসের আবাহন। সাহিত্য ইতিহাস এবং পরম্পরার ভাব-সম্মিলনে রঙিন হয়ে উঠবে সংখ্যাটি। লিখবেন বিজয় আঢ্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, শেখর সেনগুপ্ত, সুমিতা ঘোষ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

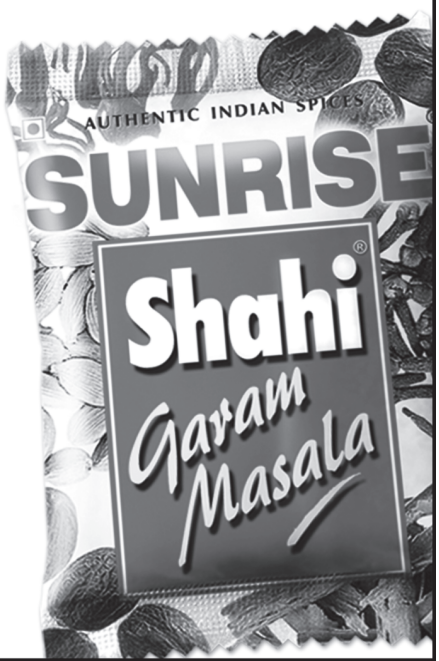
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শৌর্যে, কৌশলে ভারতই শ্রেষ্ঠ

ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে বারেবারেই তাহার শৌর্যের পরিচয় দিয়াছে। ৭১-এর যুদ্ধে, ৬৫-র যুদ্ধে, কার্গিলে এবং অতি সম্প্রতি ভারতীয় বায়ু সেনার বিমান হানা বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সমর কৌশলে এবং সমরাস্ত্রে ভারত পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক উন্নত। সম্প্রতি ভারতীয় বায়ু সেনা পাকিস্তানের আকাশসীমা অতিক্রম করিয়া জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিগুলি যেভাবে ধ্বংস করিয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনীয় উন্নতমানের সমর কৌশল সাম্প্রতিককালে অন্য কোনও রাষ্ট্রই প্রদর্শন করিতে পারে নাই। বায়ুসেনার এই বিমান হানার ভিতর দিয়া জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি যেমন ধ্বংস করিতে সফল হইয়াছে ভারত, তেমনই, পাকিস্তানের প্রতি একটি পরিষ্কার বার্তাও ইহার মাধ্যমে প্রেরিত হইয়াছে। বার্তাটি হইল, ভারত এমনই একটি শক্তিধর রাষ্ট্র যে, যে কোনও মুহূর্তে অবলীলায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যাঘাত করিবার মতো শক্তি ধরে। অতএব, ভারতের এই শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া পাকিস্তান যেন সংযত থাকে। পাকিস্তান ভুলিয়া যাইতেছে যে, ভারতের সৌজন্যের অর্থ তাহার কাপুরুষতা নহে। পাকিস্তান সীমা অতিক্রম করিলে যে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভারত পিছুপা হইবে না—ইহা পাকিস্তানি সেনানায়করা মনে রাখিলেই ভালো। অবশ্য এই একটি বিমান হানার পর পাকিস্তানের সুর অনেক নরম হইয়াছে। পাক প্রধানমন্ত্রী এখন শান্তির বার্তা দিতে চাহিতেছেন। ভারতীয় বায়ুসেনার বীর সেনানী অভিনন্দন বর্তমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়াছে পাকিস্তান। বুঝাই যাইতেছে, পাকিস্তানের এই আচরণের পিছনে ভয় কাজ করিতেছে। পাকিস্তান বুঝিতে পারিয়াছে, ভারত যদি আরও বেশি প্রত্যাঘাত করে, তবে পাকিস্তান নামক দেশটিরই অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

ভারতীয় সেনার শৌর্যের সম্মুখে পাকিস্তান যখন নতজানু, সমগ্র দেশবাসী যখন ভারতীয় বায়ুসেনার কৃতিত্বে গৌরবান্বিত, তখন এই দেশেরই কতিপয় রাজনীতিবিদ বেসুরে কথা কহিতেছেন। এই রাজনীতিবিদদের আচরণ পাকিস্তানকে উৎসাহিত করিতেছে। পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল কাজ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান হানার পর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ওই বিমান হানায় কতজন জঙ্গি মারা গিয়াছে, তাঁহার প্রমাণ কোথায়? তাহারও পূর্বে পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর চল্লিশ জন জওয়ান নিহত হইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার সতীর্থরা বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই জওয়ানদের মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এই বিরোধী নেতা-নেত্রীদের এহেন অপরিণামদর্শী কথাবার্তা পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পাকিস্তান এই রাজনীতিবিদদের কথাগুলিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যবহার করিতেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিগ্বিজয় সিংহরা এই ধরনের কথাবার্তা বলিয়া আসলে যে পরোক্ষে পাকিস্তানেরই স্বার্থ সাধিত করিতেছেন— তাহা আর ব্যাখ্যা করিবার অপেক্ষা রাখে না। বায়ুসেনার হামলায় কতজন জঙ্গি নিহত হইয়াছে—এই প্রমাণ যখন ইহারা চান, তখন কার্যত ইহারা দেশের সেনাবাহিনীর বীরত্বকে অস্বীকার করেন, সেনাবাহিনীর মনোবল ভঙ্গ করেন, তদুপরি শত্রু দেশের মিথ্যা প্রচারের সুযোগ করিয়া দেন। ইহাদের এই আচরণ আর যাহাই হউক দেশভক্তের আচরণ নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিগ্বিজয় সিংহদের দল সর্বদলীয় বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ লইবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। কাজেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগ্বিজয় সিংহরা যদি আজ প্রমাণ চাহেন, দেশের সেনাবাহিনী এবং দেশের মানুষ তাহাদের সেই প্রমাণ দিতে বাধ্য নন।

সুভাষিতম্

দুর্জন প্রিয়বাদী চ নৈতদ্‌বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়েতু হলাহলম্।। (হিতোপদেশ)

দুর্জনরা প্রিয়বাদী, তাই তাদের বিশাস করার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের মুখে মধু থাকলেও অন্তরে বিষ ভর্তি থাকে।

যারা পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার কথা বলছে, তারা জ্ঞানপাপী

প্রবাল চক্রবর্তী

বেজায় হট্টগোল শুরু হয়েছে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই! যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই! খুব সুন্দর সুন্দর কথা, চকোলেট চকোলেট গন্ধ তাতে। নেশা ধরে যায়। শুনতে শুনতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার এক পূর্বজ, পার্টিশনের পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। কোনো এক প্রসঙ্গে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলেছিলেন, ''ভালো ভালো ভালো! শুনে শুনে কান পচে গেল! এটাকে কি কেউ খারাপ করতে পারে না?'' জানি না, কী যন্ত্রণায় বলেছিলেন সেকথা।

যাই হোক, হট্টগোলের কথা বলছিলাম। সেই হট্টগোলের মাঝদরিয়া থেকে অনেকরকম গলা শুনতে পাচ্ছি। ভুতুড়ে নাঁকি-নাঁকি সব স্বর! শুনছি তেঁনারা বলছেন, যুদ্ধ খুব খারাপ। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হলে এই হবে, ওই হবে। যুদ্ধের কী দরকার? দুঃখের কথা, এনারা ইতিহাসের খোঁজ রাখেন না। স্বাধীনতার পর ভারত ঠিক করেছিল, সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। গান্ধীজীর বাচ্চা আমরা, অহিংস সত্যাগ্রহ দিয়েই বাজিমাত করব। ফল? পাকিস্তানের আক্রমণ, চীনের আগ্রাসন। পালা পালা, অহিংসা মাথায় থাক, আপাতত সেনাবাহিনীর বুটে হত্যে দে!

অনেকে বলছেন, হাজার কিলো বোমার টাকা বাঁচিয়ে হাসপাতাল ও স্কুল গড়তে পারলে কত গরিবের উপকার হতো। এনাদের কাছে প্রশ্ন, সেটা না হয় করা গেল। তারপর কোনো সন্ত্রাসী এসে রুগি সুদ্ধু ওই হাসপাতাল আর ছাত্র-ছাত্রী সুদ্ধু ওই স্কুল বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে না, সেই গ্যারান্টি দিতে পারেন কি?

ভুশণ্ডীর মাঠে জড়ো হয়ে তেনারা বলছেন, যুদ্ধ হলে ওদের দেশের কত মানুষ মারা যাবে! তাদের প্রাণের কি কোনো মূল্য নেই? তাদের ঘরে দুধের শিশু নেই? তাদের বাঁচার অধিকার নেই? তা, বাড়িতে ডাকাত পড়লে সেই ডাকাতের ঘরের শিশুদের কথা চিন্তা করে ডাকাতের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন তো? গ্যারান্টি দিচ্ছেন তো? সেই সময় পুলিশ আপনাকে বাঁচাতে এলে পুলিশকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন তো? ঠিক তো? যদি তা না করেন, তাহলে আজ আমার দেশের সেনাদের গালাগালি দেওয়ার অধিকার আপনাকে কে দিল?

আজ যদি দেশ না বাঁচে, তবে আগামীকাল আপনার পরিবার বাঁচবে কি? সিঞ্জর পর্বতের ইয়েজিদিদের জিজ্ঞেস করুন, বাস্তবটা জানতে পারবেন। বইটই পড়ার অভ্যেস আছে এখনো? নাদিয়া মুরাদের 'দ্য লাস্ট গার্ল' পড়েছেন কী? পড়লে জানতে পারবেন, আপনারা যেটা করতে চাইছেন, তার পরিণতি কী। যুদ্ধ এড়াতে ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল ইয়েজিদিরা। পেরেছে কি? আইসিস তাদের সবংশে নিধন করেছে। যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসী বানিয়ে বিকিকিনি করেছে। সেই পরিণতি চান, নিজের পরিবারের জন্য? জইশ-ই-মহম্মদের পিশাচের দলবলের হাতে? অসুখ করলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে এসব অহিংসার কথা কেন মনে হয় না? যে জীবাণুগুলো আপনার কোষগুলোকে আক্রমণ করেছে, তাদের বাঁচার অধিকার নেই? ইমিউনিটিবিহীন শরীরের একটাই পরিণতি— মৃত্যু। ঠিক তেমনি, যে দেশ আক্রমণকারীর প্রাণের চিন্তা করে, তাদেরও একই পরিণতি।

বলছেন, যুদ্ধের টাকা বাঁচিয়ে গরিবদের কল্যাণ করতে হবে। সত্যিই গরিবদের কল্যাণ করতে চান? রিক্সায় উঠে রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করা বন্ধ করুন। ফুটপাতের দোকানদারের সঙ্গে অসভ্যের মতো দরদাম করা বন্ধ করুন। কাজের লোকেদের পুজোর বকশিস দেওয়ার সময় একটু দরাজ হোন। নিজের পরিবারের জন্য শপিং করতে গিয়ে গরিবদের প্রতি এই মমতাটা বাঁচিয়ে রাখুন। তাতে গরিবদের আখেরে বেশি উপকার হবে। আর যদি সেটা না পারেন, ক্ষতি নেই। শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন বন্ধ করুন। ওতে গরিবের কোনো উপকার হয় না।

এটা অনেকেই বোঝে না যে, আইসিস একদিনে তৈরি হয়নি। আইসিস হলো ভার্সান ২.০। আর পাকিস্তান হলো তার ভার্সান ১.০। যে হিসেবে আইসিস কোনো দেশ নয়, সেই হিসেবে পাকিস্তানও কোনো দেশ নয়। সভ্যতা কৃষ্টি, পরম্পরা, ইতিহাস, ভূগোল, লোকসংস্কৃতি --- সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র উপাসনাপদ্ধতির ভিত্তিতে কোনো নেশন-স্টেট তৈরি হতে পারে না। পাকিস্তানের ঘোষিত উদ্দেশ্য— জিহাদ-ফি-সবিলিল্লাহ এবং ঘজওয়া-এ-হিন্দ।

এই শব্দদুটোর মানে জানবার দরকার আছে ভারতবাসীর। একান্ত অনুরোধ, এই শব্দদুটোর ওপর একটু রিসার্চ করুন। আর যদি সেটা না করতে পারেন, তাহলে অন্তত আইসিসের মানসিকতা ও কার্যপদ্ধতি কী সেটা জানুন। তাতেই শব্দদুটোর নিহিতার্থ জানা হবে। কী চায় এরা? এরা চায়, পৃথিবীতে শুধু একপাল খুনি বর্বর পুরুষ বাস করবে, সেখানে মেয়েরা পুরুষের ক্রীতদাসী ও যৌনদাসী মাত্র হয়ে বেঁচে থাকবে। এদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আলখাল্লা পরে লম্বা দাড়ি নিয়ে মরুভূমিতে তলোয়ার খেলিয়ে বেড়ানো, উগ্র সালাফি আদর্শে বিধর্মীদের নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করা, তাদের ঘরের মেয়েদের জোর করে অঙ্কশায়িনী করা। এরা ঠিক করেছে গুঁড়িয়ে দেবে প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা ও তাদের যাবতীয় কৃষ্টি। এদের সঙ্গে আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রেখে শান্তিস্থাপনের কোনো উপায় আছে কি?

একটা কথা ভালো করে বুঝে নিন। পাকিস্তান, আইসিস কোনো দেশ নয়, এরা বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি একটা গুন্ডার দল মাত্র। যারা এদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখছে, তারা হয় জ্ঞানপাপী ধান্দাবাজ, না হয় মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ▮

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

দিদির প্রশ্নের জবাব দিন। খালি ভালো ছেলেটাকে দোষ দেবেন না। ইমরান খানের মতো ভালো লোক হয় নাকি! পাকিস্তানের মতো ভালো দেশ হয় নাকি! আর সেই দেশের জঙ্গিদের মারাটাও ভালো কাজ নাকি!

দিদির কথা না শোনাটাই আপনার ভুল। পুলওয়ামা-কাণ্ড নিয়ে ডাকা সংসদীয় নেতাদের সর্বদলীয় বৈঠকে 'কড়া প্রত্যুত্তর' দেওয়ার প্রস্তাব বিরোধীদের চাপে পাশ করাতে পারেনি আপনার সরকার। উপস্থিত কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের আপত্তিতে খসড়া থেকে ওই অংশটি শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হয়েছিল। শুরুতেই তো দিদির দল তৃণমূল কংগ্রেস আপত্তি করে। পরে বাকি বিরোধীরাও সেই আপত্তি তোলেন। সবাই শুনেছে দিদির কথা। শুধু আপনিই নয়। বায়ুসেনাও আগে দিদির কথা শুনলে ভালো করত। না শুনে কেউ লোক মারে। খুন করার সময়ে হিসেবটা তো করতে হয় নাকি!

১৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সভাপতিত্বে সংসদীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমরের ডাকা বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদ, আনন্দ শর্মা, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও' ব্রায়েন, এনসিপির শরদ পাওয়ার, এনসির ফারুক আবদুল্লা-সহ অন্যান্য দলের সংসদীয় নেতারা। ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারাও। ওই বৈঠকে কেন্দ্রের তৈরি করা প্রস্তাবের খসড়ার যে অংশটি নিয়ে আপত্তি করেন বিরোধীরা, সেটি ছিল একদম শেষে। খসড়াটি পুলওয়ামার ঘটনার তীব্র নিন্দা দিয়ে শুরু হলেও শেষে 'কড়া প্রত্যুত্তর'-এর প্রস্তাব ছিল।

খসড়াটির একেবারে শেষাংশে ছিল— 'আজ আমরা দেশের নিরাপত্তা রক্ষীদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে জানাতে চাইছি যে, এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত এবং কঠিন প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।' এই প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি আসে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। তার পরেও হামলা হয়েছে। প্রথমে কিছু না বুঝে দিদিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। কিন্তু পরে তিনি বুঝেছেন বায়ুসেনা ঠিক কাজ করেনি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম নয়, বিদেশিরাই ঠিক কথা বলছে।

জঙ্গি হামলা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল থেকে গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম থেকেই জঙ্গি হামলা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার দিনে কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানকে দায়ী করলে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নবান্নে দাঁড়িয়েই বলেন— বিশদে তদন্ত না করেই কেন পাকিস্তানকে দায়ী করা হচ্ছে?

এর পরেও থামেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভোটের মুখে যুদ্ধের জিগির তোলা নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু যেদিন ভোর রাতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভারত বদলা নিল সেদিন তৃণমূল নেত্রী ভারতীয় বায়ুসেনার প্রশংসা করেছেন। শুধু প্রশংসাই নয়, বায়ুসেনার নতুন নাম দিয়ে দেন— 'ইন্ডিয়াজ অ্যামেজিং ফাইটার্স'।

এর পরেই দিদি নতুন প্রশ্ন তোলেন বায়ুসেনার সাফল্য নিয়ে। তিনি দাবি করেন আদৌ বায়ুসেনা নাকি সাফল্যই পায়নি। মমতার মন্তব্য, "গত পাঁচ বছরে উরি হয়েছে। পাঠানকোট হয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলওয়ামায় এতজন জওয়ান মারা গিয়েছেন। সরকারের কাছে তার আগাম খবর ছিল। তা সত্ত্বেও সরকার আগাম কোনও সাবধানতা নেয়নি। আর এখন ধিতাং ধিতাং তা বলে টিভি চ্যানেলকে একতরফা খাইয়ে দেশবাসীকে কেন বিপথে চালিত করা হচ্ছে?"

এখানেই থামেননি দিদি। তিনি বলেছেন, "আমি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা নিউজ পড়েছি। ওয়াশিংটন পোস্টের নিউজ দেখেছি। রয়টার্সের নিউজ দেখেছি। তাতে বলা হচ্ছে, এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। বোমাটা পড়েছে অন্য জায়গায়। বলছে টার্গেট মিস হয়েছে। মানুষ মারা যায়নি। কেউ বলছে একজন মারা গিয়েছে।"

এর জবাব দিয়েছেন খোদ বায়ুসেনা প্রধান। তিনি বলেছেন, বালাকোটে নির্দিষ্ট জায়গাতেই আঘাত হেনেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী। দেশের বায়ুসেনা প্রধান বিএস ধানোয়া জানিয়েছেন, এয়ার স্ট্রাইকে কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা তাঁর বলা সম্ভব নয় কারণ, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের কাজ লাশ গোনা নয়। বিমান বাহিনী যদি টার্গেটে হামলা করার পরিকল্পনা করে, তাহলে তারা সেই টার্গেটেই হামলা করে বলে জানিয়েছেন আত্মবিশ্বাসী ধানোয়া। ভারতীয় বায়ুসেনা জঙ্গলে বোমা ফেলে এলে পাক প্রধানমন্ত্রী এভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। কিন্তু ইমরান খানের মতো ভালো মানুষকে নিয়ে বায়ুসেনার এমন প্রশ্ন তোলা কি ঠিক? ভারতের চাপ নয়, উনি তো ভালো মানুষ বলেই অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এটা দিদি বোঝেন। দিদির ভায়েরা বোঝেন। কিন্তু মোদীজী আপনি বোঝেন না।

— **সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম



নলিন মেহতা

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গিয়ে বায়ুসেনার আঘাত

চিরাচরিত বিদেশনীতির কৌশলগত পরিবর্তন

খ্রিস্টপূর্ব ৪৯ শতাব্দীতে পরবর্তীকালের রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার তৎকালীন রোমান কেষ্টবিষ্টুদের বাধা অগ্রাহ্য করে এমন একটি অঞ্চলে ঢুকেছিলেন যে অঞ্চল প্রায় নিষিদ্ধই ছিল বলা যায়। সামরিকভাবে একটি রেখা টানা ছিল যে এরপর আর এগোলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সিজার বলেছিলেন আমার এই সীমান্তরেখা পেরোনো নির্ধারিত হয়েই আছে। এই বিপদসঙ্কুল হিংস্র জনজাতি-অধ্যুষিত অধুনা বেলজিয়ামের এলাকার প্রান্তসীমাকে বলা হতো 'রুবিকন'। সব বাধা নিষেধ এড়িয়ে এখানে প্রবেশ করাই ছিল সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত রীতি ও নিয়মের উলঙ্ঘন। একবার এই সীমা পার করার অর্থই আর পুরনো প্রথায় ফেরা যাবে না। এটি হবে যুগান্তকারী পরিবর্তন। পুলওয়ামা হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতীয় বায়ুসেনা এই লক্ষণরেখা পার করে যুগান্তকারী অবস্থান নিয়েছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার প্রসঙ্গে ভারতীয় বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে বলেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার মিরাজ ২০০০ বিমানের এই বোমাবর্ষণ কিন্তু পূর্ণমাত্রার পরদেশ আক্রমণ আদৌ নয়। এই যে সেনাবাহিনীর চিরাচরিত অবস্থান থেকে সরে এসে পুরোদস্তুর যুদ্ধ প্রক্রিয়া থেকে গা বাঁচিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করা এটিই সেই রুবিকন অর্থাৎ লক্ষণরেখা পার ও এক অর্থে জলে নেমেও চুল না ভেজানো।

প্রথমত এই অত্যন্ত সুচিন্তিত 'non military premetive action' অর্থাৎ শত্রুদেশের সৈন্য বা সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত না করে বা অসামরিক জনগণকে অক্ষত রেখে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদীর ডেরাকে নির্মূল করে আসার যে অভূতপূর্ব সাফল্য ভারত দেখাল তা সামরিক নীতির ক্ষেত্রে নতুন এক সংজ্ঞা সৃষ্টি করল। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী যে নিবারণমূলক আক্রমণ চালাতে অভ্যস্ত এই কৌশল অনেকটা সেই ঘরানার। ১৯৮১ সালে তৎকালীন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মেনাচিম বিগিন সম্ভাব্য আক্রমণের সম্ভাবনাকে আগাম থমকে দিতে ইরাকের বিরুদ্ধে বাগদাদ অঞ্চলে ভারী বোমাবর্ষণ করেছিলেন। তখন এই আক্রমণকে অনেকটাই আদালতের আগাম জামিন নেওয়ার মতো 'anticipatory self defence at its best' হিসেবে সকলে মেনে নেয়। অবশ্য এই 'বিগিন তত্ত্ব' মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিরস্ত করতে ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু কী সম্ভাবনামূলক, কী প্রত্যাঘাতমূলক দু'ধরনের বিমান হানাতেই ইজরায়েল দীর্ঘদিন ধরে প্রবল পারদর্শী। এক্ষেত্রে সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত বা প্রতিবেশী সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবেই আক্রমণ করা হয়।

> 'ভারতের অভ্যন্তরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীকে সদা উত্যক্ত করে দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করাই ছিল এই প্রক্সি বা ছায়াযুদ্ধের বহু পরিচিত চরিত্র। কিছুতেই সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি তারা নিত না। এই তত্ত্বকেই হিংস্রভাবে বুঝিয়েছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো bleeding India by thousands cuts.'

পুলওয়ামার প্রেক্ষিতে ভারত ঘোষণা করেছে তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে দেশে আত্মঘাতী হামলার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে, যা দেশের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক। সেই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার খাতিরে ভারতকে নির্দিষ্ট জঙ্গি আশ্রয়স্থলগুলিতে আক্রমণ চালাতে হয়েছে। এই আক্রমণকে তাই প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের তকমা দেওয়া যাবে না। এইখানেই ১৯৮০ সাল থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে চালু থাকা যুদ্ধনীতির নিয়ম পাল্টে দিয়েছে ভারত।

এই নতুন কূট সামরিক কৌশলের তত্ত্বই হচ্ছে যে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যুত্তরে তা নিবারণের জন্য নির্দিষ্ট দেশে সেই সন্ত্রাসদের ওপর প্রত্যাঘাতমূলক হামলা চালালে তাকে কখনই সামরিক আক্রমণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসানো যাবে না। ভারতের পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণ কিন্তু অতীত যুদ্ধ ঘোষণার নিয়মকে বরাবরের জন্য বদলে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কৌশল ও সিদ্ধান্তের এই

ভূমিকম্পের অনুভব সৃষ্টি করা কাজকে কখনই খাটো করে দেখার কারণ নেই। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে ৫২৭ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হলেও ভারতীয় বিমানবাহিনী সদাসতর্ক ছিল যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে এলওসি না লঙ্ঘিত হয়। দুটি লড়াকু জেট ও একটি আক্রমণকারী হেলিকপ্টার শত্রু আক্রমণে হারাতে হলেও সেনা এলওসি অতিক্রম করেনি। বাজপেয়ী সরকারের কড়া সতর্কবাণীর প্রেক্ষিতে হয়তো বলা যায় বায়ুসেনা কিছুটা আচমকা স্থগিতাদেশের অপেক্ষায় (এলওসি-র ক্ষেত্রে) ত্রস্ত হয়ে লড়াই করত। এইবারের বায়ুসেনার পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে গভীরে ঢুকে 'খাইবার পাখতুনকা' অঞ্চলের বালাকোট জঙ্গি ছাউনি ধ্বংস করা অভূতপূর্ব। এই বালাকোট আবার কুখ্যাত আবোটাবাদ, যেখানে পাকিস্তানের মিলিটারি অ্যাকাডেমি অবস্থিত, তার থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। এখানেই পাকিস্তানের নজরদারিতে নিরাপদ ডেরা গেড়েছিল বিশ্বত্রাস ওসামা বিন লাদেন। এই ঘৃণ্য স্থানেই মার্কিন নৌসেনার বিশেষ পরাক্রমী কম্যান্ডোরা তাকে হত্যা করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই ১৯৭১-এর পর এই প্রথম পাকিস্তানের এত ভেতরে সক্ষম হামলা চালাল।

তৃতীয়ত, এই আক্রমণ ২০১৬ সালের বিখ্যাত 'সার্জিকাল স্ট্রাইক'-এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধারার। প্রবীণ সমর বিশারদরা ভালোই জানেন যে সেনার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী পূর্ববর্তী সরকারের আমলেও স্থানীয়ভাবে আক্রমণের প্রত্যাঘাত করতে ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু উরি পরবর্তী শত্রুঘাঁটিতে গিয়ে আঘাতের ভয়ংকরতা ও ব্যাপ্তি এবং সরকারের নাগরিকদের মধ্যে এর প্রচার আগেকার সমস্ত লড়াইকে একেবারেই ম্লান করে দেয়। ধীরে ধীরে জনমনেও এই নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা গড়ে উঠছিল। এই ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়েই সরকার এতদূর এগোতে পারল একথা বলা যায়।

চতুর্থত, তত্ত্বগতভাবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে একটা জটিল হিসেব নিকেশ করে বোঝানো হতো এবং তারা নিয়ন্ত্রিত



পাকিস্তানে বিমান হানা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান।

হতো একটি নির্দিষ্ট ভাবধারায়। ভারতের অভ্যন্তরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীকে সদা উত্যক্ত করে দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করাই ছিল এই প্রক্সি বা ছায়াযুদ্ধের বহু পরিচিত চরিত্র। কিছুতেই সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি তারা নিত না। এই তত্ত্বকেই হিংস্রভাবে বুঝিয়েছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো bleeding India by thousands cuts. শরীরে বহুবিধ ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত ঘটিয়ে ভারতের মৃত্যু ঘটান হবে। এটা আরও কার্যকর মনে করা হয়েছিল ছিল ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্র পাকিস্তানের হাতে আসার পর। পাকিস্তান মনে করত সন্ত্রাসীহামলা, আত্মঘাতী হামলার মাত্রা বাড়ালেও ভারত যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। কারণ সেই পারমাণবিক অস্ত্রের জুজু। যদিও ভারতের হাতে তা আগেই মজুত ছিল। পাকিস্তান এটাকে খেলার চেহারা দিয়েছিল।

সেই ২৬/১১-এর মুম্বইয়ের নৃশংস হত্যালীলা থেকে সদ্য ঘটা পুলওয়ামার আত্মঘাতী আক্রমণ পর্যন্ত নিরন্তর জঙ্গি হামলার প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের ওপর কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় এক ধরনের অসহায়তার সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ুসেনার এই ঝটিতি বোমারু আক্রমণ পুরনো ধীরে ধীরে যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহাওয়া তৈরি করে শেষমেশ তাকে এড়িয়ে চলার নীতিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক কায়দায় জবাব দিতে যে ভারত গড়িমসি করবে না, বরাবরের জন্য তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামরিক পরিভাষায় এর retaliation বা জবাবি হামলা পাকিস্তানের দিক থেকে যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাশিত। তার মোকাবিলায় আমরাও অনেকটা ইজরায়েলি মডেলের ধাঁচে রকেট আক্রমণের পর প্রস্তুত থাকার মতো সজাগ রয়েছি।

মাথায় রাখতে হবে, তেলআভিবকে কিন্তু কোনো পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় না বা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশটির আয়তনও পাকিস্তানের মতো নয়। ফলে তার সেনাবাহিনীর বহরও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক ছোটো। এই সূত্রে একটি ধূসর অতীতের প্রসঙ্গ এসে যায়। সংঘর্ষস্থল বালাকোট হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে মহারাজা রণজিৎ সিংহ এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম জেহাদি রায়বেরিলির সাইদ আমেদ ও শা ইসমাইলকে তার শিখ বাহিনী নিয়ে ১৮৩১ সালে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদ আয়েষা জালালের বিশ্লেষণটিতে বিগত শতাব্দীর ৯০ এর দশক থেকে ঠিক এখানেই জেহাদি তৎপরতার নব উন্মেষ ও কালগ্রাসে সন্ত্রাসবাদের কারখানা হয়ে ওঠার মধ্যে স্থান মাহাত্ম্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক যোগসূত্রটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে তা অনিশ্চিত হলেও ভারত পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চলমানতায় বালাকোটের আক্রমণ এক নতুন দিকনির্দেশ। ■

পাকিস্তানের শান্তির বুলি শুধুই লোকদেখানো

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অ:ব: প্রাপ্ত)

পুলওয়ামার সন্ত্রাসবাদের ঘটনার পর খুব দ্রুতই পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে। সি আর পি এফ কর্তারা একাশিটা বাসের এক কনভয়ে প্রায় আড়াই হাজার জওয়ানকে জম্মু থেকে শ্রীনগর পাঠাচ্ছিলেন। যদিও রাস্তাটা জাতীয় প্রধান সড়ক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গাড়ি ও ওই রাস্তায় সব সময় চলাচল করেছে, কিন্তু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের কথা মাথায় রাখেনি। বিশেষ করে পুলওয়ামা অঞ্চলটি জয়েশ সন্ত্রাসবাদীদের গড় হিসাবেই পরিচিত। কয়েকটি বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থায় সুরক্ষার প্রয়োজন। যেমন কনভয় রওনা হওয়ার তারিখ, সময় গন্তব্যস্থল, কতজন যাবেন, কী ধরনের গাড়ি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গোপনীয়তা রাখার প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা সাত-আট দিনের সময় পেয়েছিল পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নেওয়ার। যেমন বিস্ফোরক বোঝাই একটা গাড়ি প্রস্তুত করা। সেই গাড়ি দিয়ে কনভয়ের একটা গাড়িতে ধাক্কা মারা। এই পদ্ধতিটাও প্রথমবার তারা প্রয়োগ করেছে। যদি রাস্তায় পথ-প্রহরী থাকতো, তাহলে তারা বাধাও দিতে পারত। অথবা গাড়িটিকে রাস্তার নিকটে আসতে বাধা দিতেও পারতো। এই আত্মঘাতী আক্রমণে সিআরপিএফ-এর ৪০ জন জওয়ান প্রাণ হারালেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেছিলেন, এই আক্রমণের চরম বদলা নেওয়া হবে। নেওয়াও হলো, কেউ জানতেও পারল না। পাকিস্তান জয়েশ জঙ্গিদের সীমান্ত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোট, চকোটি, মুজফ্‌ফরাবাদ অঞ্চলে যেখানে জয়েশের মুখ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে সেইসব তথ্য ছিল। ভারতের ১২টি মিরাজ বিমান রাত প্রায় তিনটের সময় উড়ে গেল। অধিকৃত ওই অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিল। একজনও সাধারণ নাগরিক হতাহত হয়নি। বিমানগুলি নিরাপদে দেশের মাটিতে ফিরে এল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে।

এই আক্রমণ এমন নিপুণতার সঙ্গে করা হলো, বিমান বাহিনীকে শত অভিনন্দন দিলেও কম হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ''ভারত আক্রমণ করলে প্রতি আক্রমণের চিন্তা করবো না, প্রতি আক্রমণ হবেই।'' ভারতের আক্রমণে অন্তত ৩৫০ জন সন্ত্রাসবাদী ও তাদের প্রশিক্ষক, অন্য কর্মকর্তারা হতাহত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। মাসুদ আজহার বড়োমুখ করে ঘোষণা করেছিল জয়েশ-ই-মহম্মদ এই হামলা করেছে। একটাই চিন্তা তখন সমস্ত ভারতবাসীর মাথায় ঘুরছিল 'কোথায়, কখন, কোন্‌পথে স্থলসেনা, নৌ-সেনা, বিমান হানা অথবা সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রমণটা হবে?' ভারতের সমস্ত সুরক্ষা বাহিনী ভারতের সমস্ত সীমান্তে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল। আক্রমণটা অবশেষে এল বিমানবাহিনীর দ্বারা। লড়াকু বিমানগুলি ভারতের পুঞ্চ সীমান্তে আঘাত দেওয়ার জন্য বোমা রকেট ইত্যাদি নিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে এল।

পাকিস্তান যাই বলুক সন্ত্রাসবাদ তারা চালিয়ে যাবে ভারতের বিপক্ষে, কারণ কাশ্মীর তাদের চাই-ই চাই। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে স্থল, জল এবং আকাশপথ এমন ভাবে নিশ্ছিদ্র প্রহরায় বেঁধে রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশ, নেপাল, পশ্চিম সীমান্ত অথবা জম্মু-কাশ্মীর দিয়ে একটি মাছিও অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

একটি এফ-১৬ বিমান ভারতের বিমান বাহিনীর অস্ত্রাঘাতে ভেঙে পড়ল। বিমানের পাইলট ও বিমানটি ভূপতিত হলো সীমান্তের অপর পারে। পাক রকেট অস্ত্রাঘাতে ভারতের একটি মিগ বিমানও ভেঙে পড়ল। পাইলট প্যারাসুটে নেমে পড়লেন। কিন্তু পড়লেন সীমান্তের অপর পারে। তিনি পাক সুরক্ষা কর্মীদের হাতে ধরা পড়লেন, যুদ্ধবন্দি হলেন। পাকিস্তানের বিমানগুলি তাদের অস্ত্রসম্ভার যত্রতত্র ফেলে পালিয়ে গেল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াতে পারল না। তারা এসেছিল ভারতের ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার, ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্স এবং অন্য অস্ত্র-উপকরণ, খাদ্য, পোশাকের ভাণ্ডার গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। পালিয়ে বেঁচেছে। এফ-১৬ বিমানের কিছু টুকরো থেকে ওই বিমানটিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। জানা যাচ্ছে ভারতের ভূপতিত মিগ বিমানের বৈমানিক উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমান এফ-১৬ বিমানটিকে ভূপতিত করে পাকিস্তানের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রমাণ-সহ অভিযোগ জানিয়েছে পাকিস্তান চুক্তিভঙ্গ করে আক্রমণে এফ-১৬ বিমান ব্যবহার করেছে।

এটা প্রমাণিত হয়েছে, অভিনন্দন কোনো প্রকার আক্রমণের জন্য আকাশে ওড়েননি। তিনি পাক বিমান বহরের আক্রমণ রুখতেই উড়েছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই ধরনের ঘটনায় যারা যুদ্ধবন্দি হয় তাদের ছেড়ে দেওয়াই প্রথা। কোনো যুদ্ধ হয়নি। ভারত কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতেই বিমান আক্রমণ করেছিল, তাতে একজনও সাধারণ নাগরিক হতাহত হননি। বিশেষ করে জয়েশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার ঘোষণা করেছিল তার সংস্থাই পুলওয়ামার ঘটনা ঘটিয়েছে। পাকিস্তান এই আক্রমণের বিষয় চিন্তা করে, ধারণা করেছিল ভারত 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করে আবার সীমান্তের নিকটবর্তী সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানাগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার

প্রয়াস করবে। সেজন্য তারা সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মুজফ্‌ফরাবাদের বালাকোট, চকোতিতে যেখানে জয়েস-ই-মহম্মদের প্রধান প্রশিক্ষণ ঘাঁটি সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। তারা ভারতেই পারেনি, ভারত যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে (মিরাজ ২০০০) সুনিপুণ ভাবে ওই ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দেবে। হতাহতের সংখ্যা আনুমানিক। কিন্তু পাকিস্তান অভিযোগ করেছে ভারতীয় বিমান পাইন গাছের জঙ্গলের ভীষণ ক্ষতি করেছে। কিন্তু হতাহতের কোনো তথ্যই প্রকাশ করেনি। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত যে সব চিত্র পাওয়া গিয়েছে টেলিভিশনের মাধ্যমে সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই বিষয়ে দুটি প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। মাসুদ আজহারের দাবি জয়েশ-ই-মহম্মদ পুলওয়ামায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, যা প্রমাণ করছে জয়েশের সন্ত্রাসবাদীরা জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, এবং দ্বিতীয়ত মাসুদ আজহার পাকিস্তানের এক হাসপাতালে থাকায় পাকিস্তান থেকেই ওই সন্ত্রাসের ঘটনার পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং পরিচালনা করা হয়েছে। এর পিছনে পাক আই এস আই এবং সামরিক বাহিনী রয়েছে। যদি সত্যিই মাসুদ আজহার বিশেষ ভাবে অসুস্থ থাকে, তাহলে তাঁর শ্যালক এবং ভ্রাতা ওই সন্ত্রাস পরিচালনা করেছে। সমস্ত বিশ্ব অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেল পাকিস্তানই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর। তাদের ভূমি থেকে, তাদের দ্বারাই আফগানিস্তান ও ভারতে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯/১১-র ঘটনারও প্রধান সাক্ষী। চীনও এবার কোনো প্রকারের বিরোধিতা না করে শান্তিপূর্ণ ভাবে সবকিছু মিটিয়ে নেওয়ার আবেদন করেছে। সমস্ত বিশ্ব এখন পাকিস্তানের বিপক্ষে। পাকিস্তানের ভূমি যে বহু বছর ধরে সন্ত্রাসীদের চয়ন, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, বিস্ফোরক সরবরাহ করে চলেছে সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকিস্তানের বাঁধা বুলি 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং যা কিছু ঘটছে তার জন্য দায়ী নন স্টেট অ্যাক্টরর্স'— আর ধোপে টিকবে না। ২৬/১১-র প্রধান হোতা লস্কর-ই-তৈবার হাফিজ সঈদের বিরুদ্ধেও ভারত অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিল। আজমল কাসব ধরা পড়ে প্রকাশ্যে

মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে বুঝিয়ে দিতে হবে সেনাদেরও মানবাধিকার আছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও বুঝতে হবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাহলেই কাশ্মীরের বাইরের সন্ত্রাসবাদী এবং ভিতরের দেশদ্রোহীদের সম্যক মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

সব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল এবং পাক আই-এস-আই ও সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের কথাও প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাক বিচারালয়ে বিচারের প্রহসন হয়েছিল। হাফিজ সঈদ এখন নিরপরাধ মানুষ হিসেবে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাকিস্তান বলছে, আরও অকাট্য প্রমাণ চাই। কোণঠাসা পাক প্রধানমন্ত্রী এখন ভারতকে বলছেন, পুলওয়ামা কাণ্ডের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিলে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। সেই সঙ্গে তিনি উইং কম্যান্ডার অভিনন্দনকে ভারতের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু ভারতের নীতি তিনি জানেন, পাকিস্তানের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদীদের জেলে পুরে তার যথাযোগ্য প্রমাণ দিলে তবেই আলোচনায় বসার কথা ভারত চিন্তা করবে। এই সময়ই 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স'-এর একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল। ও আই সি এই প্রথমবার ওই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তার প্রতিবাদে পাকিস্তান ওই সভায় যোগদান করেনি। ভারতের তরফে ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ ওই সভায় যোগদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন। পাকিস্তানের জানা উচিত ছিল বিশ্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব থেকে বেশি মানুষ ভারতে বাস করেন। ইন্দোনেশিয়ায় ভারত অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ হয়তো বসবাস করে থাকেন। সমস্ত ইসলামিক রাষ্ট্রও ভারতকে সমর্থন জানিয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কড়া ভাষায় পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন এবং কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন।

এফ-১৬ বিমান কোনো ভাবেই আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিমান পাকিস্তানকে দেওয়ার সময়ই শর্ত দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার্স এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র-গোলাগুলির এবং খাদ্য-বস্ত্র- পোশাক ইত্যাদির ভাণ্ডার ধ্বংস করার জন্য বিমান আক্রমণে এফ-১৬ বিমানও নিয়োগ করেছিল। একটি এফ-১৬ বিমান ভেঙে পড়ে। ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতিরোধে বাকি বিমান পালিয়ে বাঁচে। অভিনন্দনের মিগ বিমান এফ-১৬-কে ধ্বংস করেছে বলেই সংবাদ। কিন্তু অভিনন্দন পাকিস্তানের হাতে ধরা পড়ে যান। তাঁর উপর কী ধরনের অত্যাচার করা হয়েছিল জানা নেই। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রকাশ পেতেই এবং তিনি যে ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত দিয়েই ভারতে প্রবেশ করবেন শোনার পরই হাজার হাজার মানুষ তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করার জন্য হাজির হয়েছিলেন। বেলা প্রায় ১২টার সময় তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভারতের 'বিমান অ্যাটচীর' হাতে তাঁকে সমর্পণ করা হয়। প্রতীক্ষারত পুরুষ-মহিলারা জানতে পারেন তিনি সীমান্তের নিকটেই পৌঁছে গিয়েছেন। কিছু নিয়মানুসারে কাগজপত্রে তাঁর হস্তাক্ষর হওয়ার পরই তিনি সীমান্ত পারাপারের জায়গায় পৌঁছে যাবেন। মহিলা, পুরুষ ঢোল বাজিয়ে নাচতে থাকেন, আর একটু পরেই তাঁদের প্রাণের অভিনন্দনকে সাদরে অভিনন্দন জানাতে পারবেন। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর বিকেল গড়িয়ে রাতের আঁধার সবদিক ঢেকে দিল। মনে হলো, তাহলে কি শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রত্যার্পণ বিঘ্নিত হলো? হঠাৎ দেখা গেলে দূর থেকে অভিনন্দনের ঋজুদেহ পাকরেঞ্জার্সের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। দুইজন বিমান বাহিনীর এয়ার ভাইস মার্শাল অভিনন্দন

বর্তমানকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গেট খোলার পর পাক রেঞ্জার্সরা দাঁড়িয়ে গেল। অভিনন্দন ধীর পায়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন। উদ্বেল জনতা, আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন— দের হ্যায়, দুরস্ত হ্যায়! আনন্দে তাঁরা নেচে উঠলেন। সারা দিনের প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটল। পাকিস্তান কথা রেখেছে। রাত তখন সাড়ে নয়টা। পরে জানা গেল, পাকিস্তানের এক নাগরিক কোর্টে মামলা করেছেন, উইং কম্যান্ডার অভিনন্দনকে মুক্তিদেওয়া যাবে না কারণ তিনি পাকিস্তানের শত্রু, পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর বিমানকে আঘাত করেছেন। ইসলামাবাদের বিচারালয়ে সেই মামলার শুনানি চলছিল। শেষমেশ বিচারক মামলা খারিজ করে অভিনন্দের মুক্তির আদেশ বহাল রাখলেন। সমস্ত বিশ্ব এই প্রহসনের দিকে তাকিয়ে ছিল চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছে, অভিনন্দনকে মুক্তি দাও, আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে নাও। কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। পাকিস্তান তার ভূমি থেকে সন্ত্রাসবাদের সমস্ত অঙ্কুর নির্মূল করে ভারতকে প্রমাণ দিক ভারতের ভূখণ্ডে যত সন্ত্রাসবাদী রয়েছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে তাদের বিচার করে শাস্তি দিক তারপরই ভারত আলোচনার কথা ভাববে।

অভিনন্দন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন। তাঁকে দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তাঁর শারীরিক, মানসিক অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি নাকি বলেছেন, তাঁকে প্রায় ৬০ ঘণ্টা বন্দি রাখাকালীন তাঁর উপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, অনেকবার তাঁকে জেরা করা হয়। তাঁকে রেডিয়ো, টিভি, সংবাদপত্র কিছুই দেখতে বা পড়তে দেওয়া হয়নি। এমনকী তাঁর যে মুক্তির আদেশ হয়েছে, তাও তাঁকে জানানো হয়নি। অনেকেই প্রশ্ন করছেন এ সবই তো প্রচলিত আইনের প্রতিকূল। শুধু এই টুকুই বলা যায়, পাক সামরিক বাহিনী সীমান্তে পদে পদে যে ব্যভিচারিতার নিদর্শন দিয়েছে, তাদের কাছে আর কিইবা আশা করা যায়! তবে এটুকুই শান্তি যে তারা জীবিত অবস্থায় অভিনন্দনকে ফেরত পাঠিয়েছে এবং সে পায়ে হেঁটে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যায়, এরপর পাক-ভারত সম্পর্ক কেমন থাকবে। যখন পাকিস্তান পুলওয়ামা ঘটাল এবং ভারত সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় বিমান হামলা করল, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু সর্বক্ষণ পাক সামরিক বাহিনী সীমান্তে প্রচণ্ড গোলাগুলি চালিয়ে গেল। শুধু সীমান্তই নয়, আশেপাশের গ্রামেও তারা গোলার আঘাত করল। কিছু নিরাপরাধ মানুষ হতাহত হলেন। ভারত প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় পাকিস্তানের শান্তির বাণী শুধুই লোক দেখান। বিশ্বকে শুধু জানানো যে পাকিস্তান কতটা শান্তির প্রয়াসী!

ভারতের পক্ষে এখন কোন পথে চলা উচিত? পাকিস্তান যাই বলুক সন্ত্রাসবাদ তারা চালিয়ে যাবে ভারতের বিপক্ষে, কারণ কাশ্মীর তাদের চাই-ই চাই। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে স্থল, জল এবং আকাশপথ এমন ভাবে নিশ্ছিদ্র প্রহরায় বেঁধে রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশ, নেপাল, পশ্চিম সীমান্ত অথবা জম্মু-কাশ্মীর দিয়ে একটি মাছিও অনুপ্রবেশ করতে না পারে। ২৬/১১, পাঠানকোট, উরি ইত্যাদি জায়গায় সন্ত্রাসের ঘটনা পর্যালোচনা করলে এই সুরক্ষা ব্যবস্থাই মনে আসছে। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রতি তিনটি গ্রামের জন্য অন্তত একটি করে ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করতে হবে। তারা শুধু যে সুরক্ষার জন্যই থাকবে তা নয়। গ্রামের বিপদ আপদ, ডাক্তার, ওষুধ খাদ্য সমস্যা, পরিবহণ সমস্যা অথবা বন্যা পরিস্থিতি সমস্ত বিষয়ে প্রকৃত হৃদয় দিয়ে তাদের সেবা করতে হবে। যাতে তারা সেনাবাহিনীর রাইফেলই দেখবে না, তাদের সেবার এবং ভালোবাসার মুখও যেন দেখতে পায়। এরফলে তারা যেমন সন্ত্রাসবাদীদের রক্তচক্ষুর ভয় থেকে নিস্তার পাবে, তেমনি সেনা বাহিনীকে ভালোবাসতে শিখবে। সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে এটাই একমাত্র প্রতিষেধক। আমি ভারতের সমস্ত সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং শ্রীলঙ্কায় এই স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছি। নাগাল্যান্ড, মণিপুরে শান্তি এসেছে, পঞ্জাবে শান্তি এসেছে, শ্রীলঙ্কায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। কোনো সন্দেহ নেই কাশ্মীরে এই স্ট্র্যাটেজি বিফল হবে না। ভারত বিরোধী সমস্ত দল ও ব্যক্তিকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে এবং যারা ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে তাদেরও কোনোভাবে নরম হাতে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা ভুলতে হবে। যদি কোনো মানবাধিকার সংগঠন প্রশ্ন তোলেন, তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে সেনাদেরও মানবাধিকার আছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও বুঝতে হবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাহলেই কাশ্মীরের বাইরের সন্ত্রাসবাদী এবং ভিতরের দেশদ্রোহীদের সম্যক মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক আবহের জন্য দায়ী মমতা নিজে

সুকল্প চৌধুরী

রাওয়ালপিণ্ডির বাসিন্দা মজিদ জাইদি ভারতীয় মুসলমান সমাজে একটি পরিচিত নাম। এই পাক নাগরিক সম্পর্কে আরও পরিষ্কার করে বললে আই এস এবং জামাত সমর্থক ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীর কাছে তিনি খুব জনপ্রিয়। জাইদি নিজেকে তার দেশের মদতপুষ্ট কাশ্মীরের ইসলামিক জঙ্গিদের একনিষ্ঠ সমর্থক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক বলে দাবি করেন। তবে পাকিস্তানের কোন গণমাধ্যমের সঙ্গে তিনি যুক্ত, কারও কাছে সেই তথ্য নেই। খোলাখুলি তিনি বলেন পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই তাঁর অন্যতম মদতদাতা। এই লোকটির একমাত্র এজেন্ডা ভারত বিরোধিতা করা। বিশেষ করে মোদীকে আক্রমণ করে মিথ্যে কিছু তথ্য দেওয়া। তিনি মনে করেন একমাত্র গান্ধী পরিবারের ছত্রছায়ায় কংগ্রেস ভারতীয়দের মুক্তি দিতে পারে।

এহেন ব্যক্তিটিকে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যম ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে আলোচনার টেবিলে বসায়। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর সদ্য চালু হওয়া সর্বভারতীয় একটি হিন্দি মাধ্যমের বৈদ্যুতিন চ্যানেলে জাইদি বলেন, ভারতে এই মুহূর্তে একটি মাত্র রাজ্য আছে যেখানে মুসলমানরা সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। সেই রাজ্যটি হলো পশ্চিমবঙ্গ। যদিও চ্যানেলের সঞ্চালক এবং উপস্থিত চার অতিথির মধ্যে কংগ্রেস সমর্থক আলোচক ছাড়া বাকি তিনজন এর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু স্বঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সমর্থক জাইদি উচ্চ কণ্ঠে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা 'কলকাতার প্রধানমন্ত্রীর' প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাকে বোঝানোই যায়নি ভারতের অঙ্গ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান কখনই প্রধানমন্ত্রী নন। এই রাজ্যের মুসলমানরা 'নিজেদের দেশের মতো করে' কতটা ভালো আছেন তার হরেক উদাহরণ দিয়েছেন জাইদি। তার মধ্যে একটি হলো এখানে আজান দিতে এবং ইদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে কোনও সমস্যা হয় না। এই 'রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী' মুসলমানদের কতটা কাছের তারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিজাব পরার নজির সামনে এনেছেন জাইদি। সচেতন ভাবেই তার মন্তব্য ইনশাল্লা বাংলা একদিন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হবে এবং মুসলমানদের আরেকটি নতুন দেশ হবে। তা হবে পাকিস্তানের মিত্র। এই নয়া দেশও ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। জাইদি মনে করেন বাংলার মুসলমানরাও চায় নিজেদের আলাদা স্বাধীন দেশ।

ধরে নেওয়া যাক, এই লেখার পাঠকদের একাংশ ভারতের সংখ্যাগুরু সমাজের হলেও প্রবল ভাবে তথাকথিত সেকুলার। ফলে যে কোনও কট্টর মুসলমানদের থেকেও বড়ো হিন্দু বিদ্বেষী। এই ব্যক্তিদের কাছে সেকুলারিজমের মানে হলো দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং হিন্দু বিরোধিতা। অন্তত তারা মুসলমানদের কোনো দোষ বা ত্রুটি খুঁজে পান না। একজন মুসলমান যা খুশি করতে পারে কিন্তু তার দিকে আঙ্গুল তোলা যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই তথাকথিত সেকুলার হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করে আর এস এস বা বিজেপির 'সাম্প্রদায়িকতার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে। তবে এই সেকুলারদের শূকরের মাংস খাওয়ার প্রস্তাব দিলে 'সরল মুসলমান ভাবাবেগে আঘাত লাগবে' এই আশঙ্কায় শিউরে ওঠে।

প্রশ্ন হলো, জাইদির মতো ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন কী। কারণ আর কিছুই নয় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থক তৃণমূলের তোয়াজ নীতি কতটা দূরে পৌঁছেছে তারই একটি সামান্য নমুনা দেওয়া। সকলেই জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির মূল ভিত্তিই হলো মুসলমান ভোট নিজের দিকে আনা। স্বাধীনতার পর থেকে তোষণের কারণে সারা



তসলিমা বিরোধী সভায় তৃণমূলের মন্ত্রী ইদ্রিশ আলি।

দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও মুসলমান ভোট কংগ্রেসের দিকে গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই রাজ্যে দীর্ঘদিন মুসলমান ভোট বামেদের সহায়তা করেছে। ২০০৪ সাল থেকে হাওয়ামোরগ ঘুরতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কারিগর পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় দল গঠনের সময় বুঝেছিলেন এই রাজ্যে পায়ের নীচে মাটি শক্ত করতে হলে যে কোনও মূল্যে মুসলমান মন জয় করতেই হবে। এই রাজনৈতিক 'বিচক্ষণতা' তিনিই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। শুরুতে কাজটা একটু শক্ত ছিল। কিন্তু বরকতি, ক্কারি হোসেন, দিলচাদ রব্বানি, মৌলানা মহজার আলম-সহ প্রবল হিন্দু তথা দেশ বিরোধী মুসলমান ধর্মগুরুদের প্রচুর অর্থ, উপঢৌকন এবং ক্ষমতায় এলে বিভিন্ন সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে রফা করে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে তৃণমূল কংগ্রেস। সকলেই জানেন, মুসলমান সমাজে ধর্মগুরুদের ফতোয়াই তাদের কাছে শেষ কথা। তবে শিক্ষার পরিবেশ পেয়ে খুব সামান্য হলেও মুসলমান তরুণ-তরুণীরা এখন অন্যভাবে ভাবছেন। অতীতে দেখা গিয়েছে বিজেপি সরকারের সঙ্গে জোটে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে এই রাজ্যের ৬৭ জনকে রেল দপ্তরের চাকরি দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৪৪ জন ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। রেল দপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে সেই সময় এবং পরেও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতিকে যাত্রী সুরক্ষা কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। এর জন্য বরকতি মাসিক ৫০ হাজার টাকা ভাতা ও সরকারি গাড়ি-সহ অন্যান্য সুবিধা পেতেন। একই সুবিধা পেয়েছিলেন রুকবানুর মা। এভাবে প্রথমে বিভিন্ন মুসলমান ধর্মগুরুকে ও পরবর্তী সময়ে পাক সমর্থক মৌলবাদী নেতাদের দলে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মন পেতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উগ্রবাদী মুসলিম ছাত্র সংগঠন সিমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহমদ হাসান ইমরানকে রাজ্যসভার এবং বামেদের সময় তসলিমা নাসরিন কাণ্ডে উগ্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ছড়ানোর প্রধান হোতা ইদ্রিশ আলিকে লোকসভার টিকিট দিয়ে মুসলমান সমাজের মন জয় করেছেন তৃণমূল নেত্রী। কামদুনির ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনার পরে প্রতিবাদী জনতার উপর পুলিশ লেলিয়ে গুলি চালানোর হুমকি দিয়েছিলেন সেই সময়কার বসিরহাটের সাংসদ তথা মৌলবাদী নুরুল ইসলাম। জামাতের সঙ্গে যুক্ত এই ব্যক্তি এখন বিধায়ক এবং হজ কমিটির প্রধান। উগ্র মুসলিম ছাত্র সংগঠন আইএসও এখন এই রাজ্যে বাড়ছে। সবাই বোঝেন, ক্ষমতা লাভের জন্য ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বাঘের পিঠে চড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বাঘের পিঠ থেকে নামার ক্ষমতা তাঁর নেই। ইতিহাস থেকে দেখা গিয়েছে সুযোগ পেলেই এই বাঘ থাবা বসায়। পুলওয়ামার ভয়াবহ ঘটনার পরে সারা দেশ যখন পাকিস্তান তথা ইসলামিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সেই সময় মোমবাতি পুড়িয়ে লোক দেখানো পথ হেঁটে ট্রেডমিলে চড়ার সময়টুকু বাঁচানো গিয়েছে। এরপর আর রাজ্যবাসীর প্রতিবাদ করার দরকার নেই এমন ফতোয়া জারি করা হয়েছে। এমনকী এখন আর সোশ্যাল মিডিয়ার মত প্রকাশের অধিকারও নেই। পুলিশের নজরদারি চলছে, পাকিস্তান বা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা যাবে না। ভারতমাতা কী জয় বললেও তৃণমূলের টাকায় তোষামোদে সিক্ত তাদের আসল ভোট ব্যাঙ্কাররা নজর রাখছে। পরে পুলিশ তাদের হেনস্থা করছে। পাক সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের শিকার অমর শহিদদের প্রতি সারা দেশের মানুষ খোলা মনে শ্রদ্ধা জানালেও এই রাজ্যের মানুষের কাছে তাঁদের নিয়ে ভাবা এখন ভয়ের বিষয়।

এখানেই বিষয়টি শেষ নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাতেও যেতে ভয়ের আবহ কাজ করছে। সন্দেহ, রক্তচক্ষু, সঙ্গে থেকে নজরদারি চালানো, অযাযিত ভাবে ভাব জমানোর চেষ্টা এই সব বিষয়গুলি দীর্ঘদিন থেকে চলছে। কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, খাগড়াগড়, বলাগড়-সহ বিভিন্ন ঘটনা, এছাড়া মেটিয়াবুরুজ-খিদিরপুরকে মিনি পাকিস্তান বলে চিহ্নিত করা, বঁনগা এলাকায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ, অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় প্রদান ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও কেবলমাত্র ভোটের জন্য রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ের পরে হিংস্র ছুরির ঝলক দেখা যাচ্ছে। অনেক ভুক্তভোগীর কাছে দেশভাগের সময়কার নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, এমনকী কলকাতার কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে।

একটা ব্যক্তিগত কাজে অতি সম্প্রতি বিষ্ণুপুরের আমগাছিয়ার কিছুটা ভেতরে যেতে হয়েছিল। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের শহরতলির জোকা ছাড়িয়ে পৈলান থেকে কিছুটা দূরে আমগাছিয়া। পুলওয়ামায় পাক মদতপুষ্ট ইসলামিক জঙ্গি হামলার ঘটনার পরে সারা দেশের নাগরিক যখন ব্যথিত তখন রাজ্যের সমস্ত মুসলমান অধ্যুষিত জায়গার মতো আমগাছিয়ার এই অঞ্চলও সব ধরনের 'আক্রমণের' জন্য প্রস্তুত। সদর রাস্তা ছেড়ে ছোটো রাস্তার ভেতরে যেতেই অগুনতি খারিজি মাদ্রাসা, মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে হরেক প্রশ্ন। অযাযিত ভাবে সঙ্গে চলা। ইশারায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা। ঘরের জানালা, দরজায় দাঁড়ানো কৌতূহলী মুখ, সন্দেহজনক চাউনি। সব মিলিয়ে যেন যে কোনও সময় কিছু হওয়ার আশঙ্কা। অথচ এই এলাকা থেকে কিছুটা দূরে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের সদর দপ্তর। যেতে হয়েছিল সেখানেও। মনে হলো পুলিশ কর্মীরাও খুব স্বস্তিতে নেই।

প্রশ্ন হলো, এই রাজ্যের এহেন হাল কেন, কে দায়ী এর জন্য? সবটাই কি বিজেপি বা আর এস এসের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ভাবতে হবে। বিজেপির সঙ্গে তাদের সুবিধাবাদী জোট ভেঙে বেরিয়ে আসার পর থেকে মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি, দেশ ও জাতীয়তা বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী। এমনকী দেশের শহিদ বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগকেও উপেক্ষা করতে দ্বিধা করেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচার করে চলেছে যেন 'দেবদূত' ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সমর্থকরা গলা বাড়িয়ে রেখেছে আর হিন্দুরা 'কচুকাটা' করছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী আর তাঁর দলের মিথ্যা প্রচার এতটাই লাভজনক হয়েছে যে সুদূর রাওয়ালপিণ্ডির একজন কট্টর সন্ত্রাসবাদীর সমর্থন পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর হয়তো দেখা যাবে মজিদ জাইদি 'সমর্থকশ্রী' উপাধি পাচ্ছেন আর পাকিস্তান সরকার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে 'তোষণ-ই-হিন্দ' সম্মাননা দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক যুদ্ধেও গোহারা পাকিস্তান

অম্লানকুসুম ঘোষ

ভোররাতের হানায় ভারতীয় বায়ুসেনা গুড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরস্থ জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী ভারতীয় বায়ুসেনা ও মোদী সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এতদিনকার রক্ষণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি ছেড়ে মঙ্গলবারের ঊষালগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত পেরোনোর প্রয়োজনীয় কাজটি করলো। সারা বিশ্ব বুঝে গিয়েছে একতরফা মার খাওয়ার যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে দুষ্টের দমনের যুগে প্রবেশ করলো ভারত। তবুও কারও কারও মনে প্রশ্ন উদিত হতে পারে যে পুলওয়ামার মতো বড়ো আক্রমণ না হলেও পাকিস্তান তো বরাবরই ভারতের ওপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তাহলে একবার সার্জিকাল স্ট্রাইক ছাড়া ভারত সরকার গত পাঁচ বছরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর কোনও বড়ো পদক্ষেপ করলো না কেন?

উত্তরে বলা যায়, নতুন পররাষ্ট্রনীতির প্রজ্বলিত প্রদীপ আজ সকলের চক্ষুগোচর হচ্ছে কিন্তু প্রদীপের সলতে পাকানো হয়েছে গত পাঁচ বছর ধরেই। তবে রণদামামার বজ্রঘোষে নয়, সলতে পাকানোর কাজটি হয়েছিল অর্থনীতি ও কুটনীতির নীরব মঞ্চে।

পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে আন্তর্জাতিক আর্থ-কুটনৈতিক রণক্ষেত্রে ভারত সরকার গত পাঁচ বছর কী কী পদক্ষেপ করেছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রায় পাঁচ বছর আগে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার কিছু মাস পরেই ২০১৪ সালের শেষ দিকে ইরানে চাবাহার বন্দর তৈরি শুরু করে এবং ২০১৭ সালের নভেম্বরে চাবাহার বন্দর চালু হয় ভারতের নিয়ন্ত্রণে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্রোজেক্ট ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার অনুমোদন করেন, তারপর এগারো বছর ধরে কিছুই হয়নি, সৌজন্যে কংগ্রেস।

তার আগে পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলবিহীন চারিদিক থেকে স্থলভূমিবেষ্টিত দেশ আফগানিস্তানের সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসা পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে হতো। পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগানিস্তানে পৌঁছাতো সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। করাচি বন্দর ছিল বহির্জগতের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম আর তাই পাকিস্তানের একক নিয়ন্ত্রণে ছিল আফগানিস্তানের ব্যবসা। অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয় একচেটিয়া অধিকার বা মোনোপলি। এই মোনোপলির মূল্য আফগানিস্তানকে চোকাতে হতো কড়ায় গণ্ডায়, চড়া হারে, নিজেদের অর্থনীতির শোষণ ও পাকিস্তানের অর্থনীতির সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে। এক কথায় পাকিস্তানের কাছে আফগানিস্তান ছিল সোনার ডিম পাড়া হাঁস।

তুলনায় বেশি পরিবহণ খরচসাপেক্ষ হলেও চাবাহার বন্দর একটা বিকল্প পথ খুলে দিল আফগানিস্তানের সামনে, আর করাচির বদলে চাবাহার ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের লাইফ লাইন হয়ে উঠলো। ঘোরি থেকে আবদালি যুগে যুগে ভারতবিদ্বেষী লুটেরাদের জন্মদাতা আফগানিস্তান তাই আজ ভারতের বন্ধুদেশ।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসা ছিল ২৭০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থাৎ প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার। অর্থনৈতিক মহলের আন্দাজ ছিল আগামী পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এটা ৫০০ কোটি ডলারে অর্থাৎ প্রায় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাবে। কিন্তু ২০১৮ ক্যালেন্ডার বর্ষে আফগানিস্তান-পাকিস্তানের ব্যবসা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫০ কোটি ডলারে অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার ছশো কোটি টাকায়। অর্থাৎ যা আশা করেছিল তার মাত্র দশভাগের একভাগ। স্বাভাবিকভাবেই বাকি বাণিজ্য হচ্ছে চাবাহারের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে। এতে সমৃদ্ধ হচ্ছে ভারতের অর্থনীতি, ক্ষতি হচ্ছে পাকিস্তানের। এছাড়াও আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারতের পাঁচটি শহর (দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, অমৃতসর, কলকাতা) থেকে ওই দেশের পাঁচটি শহরের



আফগান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদী।

অর্থনীতি এবং কুটনীতির আবিষ্কর্তা চাণক্য বা কৌটিল্যর একটি কথা আছে— 'যুদ্ধ রণক্ষেত্রে হওয়ার বহু আগে রাজার চিন্তাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে'। বর্তমান সরকার এই আপ্তবাক্যটি স্মরণে রেখে গোলা বারুদের যুদ্ধ শুরুর বহু আগেই যে আর্থ-কুটনীতির যুদ্ধ শুরু করেছেন তা দেশবাসীকে নিশ্চিন্ত করবে।

সরাসরি এয়ার কার্গো সার্ভিস শুরু হয়েছে গত পাঁচ বছরে। আফগানিস্তানের অসুস্থ মানুষেরা এর আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের পেশোয়ারে চিকিৎসার জন্য যেতেন, এখন তাদের গন্তব্য বদলে গেছে।

পুলওয়ামার ঘটনার পরে ভারত পাকিস্তানকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এর ফলে ভারতে হওয়া পাকিস্তানের যাবতীয় রপ্তানি উচ্চ শুল্কের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান থেকে ভারতে বছরে ৫২ কোটি ডলারের বা ৩৮০০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়াও উচ্চ শুল্ক হারের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় যে খাদ্যদ্রব্যসমূহ ভারত থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি হতো সেগুলির দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে পাকিস্তান থেকে ভারতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আমদানি হয় না। ফলে বাণিজ্য বন্ধের কারণে ভারত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেখানে পাকিস্তানের জিডিপি বছরে ২৭৭৭২০ কোটি ডলার (২০১৭-১৮), সেখানে আফগানিস্তানের সঙ্গে ৫০০ কোটি ডলারের ব্যবসা (জিডিপির ১.৮ শতাংশ) মার খেলে আর পাকিস্তানের বছরে ২৪৮২.৪ কোটি ডলারের মোট রপ্তানি থেকে ভারতে হওয়া ৫২ কোটি ডলারের রপ্তানি (মোট রপ্তানির ২ শতাংশ) বন্ধ হলে পাকিস্তানের ক্ষতি হলেও নিশ্চয়ই পতন হবে না। এখানেই স্বাভাবিক অর্থনীতি এবং যুদ্ধকালীন অর্থনীতির পার্থক্য। আফগানিস্তান যেমন সমুদ্রে যাবার জন্য পাকিস্তানের বা চাবাহারের ওপর নির্ভরশীল সেরকমই পাকিস্তানও পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যাবার ব্যাপারে আফগানিস্তানের ওপরে নির্ভরশীল। স্বাভাবিক সময়ে বাণিজ্যের কারণে স্থলপথের খুব একটা প্রয়োজন না হলেও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে (দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হলে) রসদ আনার জন্য এই স্থলপথ খুবই প্রয়োজনীয়। আজকের ভারতবন্ধু আফগানিস্তান এই স্থলপথ পাকিস্তানকে ব্যবহার তো করতে দেবেই না, বরং প্রয়োজনে পাকিস্তানের পশ্চিমদিকে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে ভারতকে নিজের দেশের জমি ব্যবহার করতে দেবে। চিকিৎসা ও বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে আগেকার মতো পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল থাকলে যা আফগানিস্তান করতে পারতো না, বরং পাকিস্তানকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকতো। এছাড়াও যুদ্ধের সময় রসদ হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বর্তমানে সে বাবদে পাকিস্তানকে বেশি খরচ তো করতে হবেই এছাড়াও বর্তমানে পাকিস্তান সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ না হওয়ায় ভারত কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যর রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধও করে দিতে পারে।

এখন মনে হতে পারে যে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া এতদিন পরে হলো কেন? আরও আগেই তো একাজ করা যেত? উত্তরে বলা যায় কোনও দেশকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনও কারণ দর্শাতে হয়। পুলওয়ামার ঘটনা গোটা বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কেন পাকিস্তানকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

এছাড়া, যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার বহু আগে যদি ভারত পাকিস্তানকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে বাদ দিত তাহলে ইতিমধ্যে পাকিস্তান নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যজনিত সমস্যার অন্য কোনও বিকল্প সমাধান (অপেক্ষাকৃত বেশি খরচাসাপেক্ষ হলেও) করে ফেলতো। তাই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঠিক আগে পাকিস্তানকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাকে সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলেছে ভারত।

অর্থনীতি এবং কুটনীতির আবিষ্কর্তা চাণক্য বা কৌটিল্যর একটি কথা আছে—'যুদ্ধ রণক্ষেত্রে হওয়ার বহু আগে রাজার চিন্তাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে'। বর্তমান সরকার এই আপ্তবাক্যটি স্মরণে রেখে গোলা বারুদের যুদ্ধ শুরুর বহু আগেই যে আর্থ-কুটনীতির যুদ্ধ শুরু করেছেন তা দেশবাসীকে নিশ্চিন্ত করবে। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

বিজ্ঞপ্তি

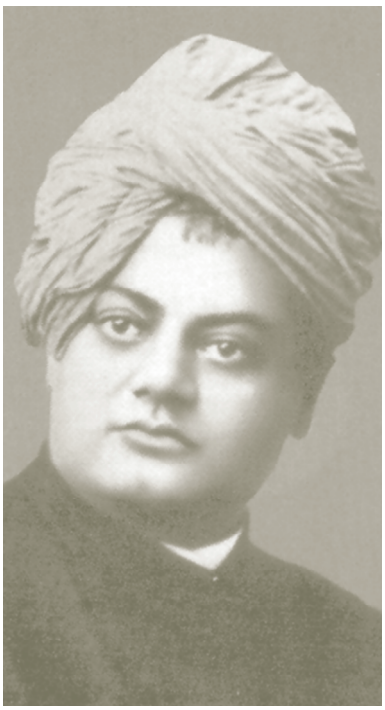
ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ

স্বস্তিকা

জীবনের মতোই সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকাটা কি সমীচীন?

বরুণ দাস



নিবন্ধের শুরু করি ভারতের যুক্তিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত একটি অসামান্য উক্তি দিয়ে, 'হিন্দুধর্মের মতো আর কোনও ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনও ধর্ম এরূপ করে না।' হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এমন অপ্রিয় সত্য ভাষণ আর কোনো হিন্দু মহাত্মা-মহাপুরুষের মুখে শুনেছি কিনা অন্তত এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। যদি কেউ স্মরণ করিয়ে দেন তো কৃতার্থ হব নিঃসন্দেহে।

হিন্দুধর্ম নিয়ে বড়াই আমাদের কম নয়। সেই বড়াইয়ের কিছু কারণও আছে। যেমন নিবন্ধের শুরুতেই তার সম্যক পরিচয় পাই স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রথমার্ধে। স্বামীজী নানা জায়গায় তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে (যা পরে তাঁর রচনা সমগ্রে সঙ্কলিত হয়েছে) হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে জোর গলায় সওয়াল করেছেন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যা বিদেশের মাটিতেও সুনামির মতোই আছড়ে পড়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দও দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে হিন্দুধর্ম তথা বেদান্তের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অন্যদের ফারাক কোথায়? ভারতের স্বনামধন্য সাধু-সন্ন্যাসী-মহাত্মারা তো বরাবর হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য-কথাই বলে গেছেন। পৃথিবীর অন্যসব ধর্ম থেকে সনাতন হিন্দুধর্মের ফারাক কোথায়, তার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কী, কেনই বা এই ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি অনেক জোরালো যুক্তি দিয়ে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যারা নিজেরা পড়ে নয়, কেবল অন্যের মুখে শুনেই পণ্ডিত বলে নিজেদের জাহির করি, তারা ওই নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছি।

উল্লেখ্য, আমরা যারা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবত-চণ্ডী সহ অন্যান্য পুরাণ-ধর্মগ্রন্থ কেবল ভক্তিভরে ফুলচন্দন দিয়ে লালশালুতে মুড়ে সযত্নে তাকে তুলে রাখি, ভুল করেও কখনও পুরাণ- ধর্মগ্রন্থের পাতা খুলে ভিতরে কী আছে দেখার কোনওরকম চেষ্টা করি না, তারা ওইসব সাধু-সন্ন্যাসী-মহাত্মাদের কথা শিরোধার্য বলে জেনে এসেছি। সাধু-সন্ন্যাসী-মহাত্মা-কৃত পুরাণ-ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছি। নিজেদের ভিতরে কখনও কোনও প্রশ্ন জাগেনি। কারণ মূলগ্রন্থ যেহেতু আমাদের পড়া নেই।

সামান্য যে দু'-চারজন নিজেদের কৌতূহল মেটাতে কিংবা জানার আগ্রহ নিয়ে পুরাণ-ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টে-পাল্টে পড়াশুনা করেন, তাঁরাই কেবল প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে সমর্থ হন। এছাড়াও অনেকে ওই বিষয়গুলির ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রাজ্ঞজনদের বিদগ্ধ আলোচনার সাহায্যও নেন। গীতা গ্রন্থটি নিজে পড়ার পাশাপাশি গান্ধীজীর 'টকস অন গীতা' গ্রন্থটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বিষয়টির গভীরে ঢুকতে পারবেন নিশ্চিত। কী অপূর্ব ব্যাখ্যা। কিংবা যাঁরা ঋষি অরবিন্দের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা পড়েছেন, তাঁরাও একই স্বাদ পাবেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের অনেকেই না জেনে, না পড়ে, না বুঝে, না বিচার করে শুধু কতিপয় মানুষের মুখে শুনে ধর্মগ্রন্থ কিংবা ধর্মের ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করি। আমাদের সেই শোনা কিংবা শুনে বোঝা কখনই সম্পূর্ণতা পায় না। নিজেদের মতো করে, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে যাঁরা ধর্মগ্রন্থ কিংবা ধর্মের ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা কেবল আমাদের অন্ধ বিশ্বাস আর আবেগ উসকে দেন। ধর্মের মূল কথা বা সুরটি থেকে যায় আমাদের আড়ালে। কেবল আড়ম্বর আর আনুষ্ঠানিকতা প্রাধান্য পায় সে ব্যাখ্যায়।

একথা শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সবধর্মের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান প্রযোজ্য। এর ফলে সবধর্মের সর্বজনীন সারসত্যটিই আমজনতার কাছে উহ্য থেকে যায়, কেবল তার বিকৃত ও অধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয় ধর্ম। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের অবাঞ্ছিত লড়াই-ই আজকের ধর্মান্ধ সময়ে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু ভারতেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ধর্ম নিয়ে অনর্থক বিদ্বেষ, সংঘাত আর হানাহানি একথাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করে।

ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ এই বিরোধকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে আজ ধর্মের সংযোগ বড়ো বেশি প্রকট। এই অশুভ সংযোগ রাজনীতির অঙ্গনকে করে তুলেছে বিষাক্ত। গণতন্ত্রকে করেছে কলুষিত। সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জীবনকে করেছে যন্ত্রণাদগ্ধ। পারস্পরিক সম্পর্কের সৌন্দর্যকে করেছে বিনষ্ট। একের সঙ্গে অন্যের সম্প্রীতিকে করেছে ধ্বংস।

অন্যের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, ঘৃণা আর সংশয় নিয়ে পাশাপাশি চলা যায় কখনও? মনুষ্যত্ব আর মানবিকতা হারিয়ে মানুষের আর রইল কী?

উল্লেখ্য, ধর্ম কিংবা রাজনীতির সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারলে এই আপাত বিরোধ কখনই সম্ভব হতো না। বরং রাজনীতি হয়ে উঠতো আরও অর্থবহ, সমৃদ্ধ এবং কল্যাণকামী। রাজনীতির সঙ্গে ন্যায়-নীতি-আদর্শ-নৈতিকতা-মানবিকতা যুক্ত হলে তা কিন্তু মানুষের প্রকৃত কল্যাণের কাজেই লাগতো। কিন্তু ও দু'টোরই আমরা নিজেদের মতো করে অন্য অর্থ করে নিয়েছি। আজ ধর্মের আর এক নামই যেন বিদ্বেষ, সংঘাত কিংবা সংশয়। আর রাজনীতি মানে এখন আর নীতির রাজা নয়, নীতিহীনের রাজা। দুর্বৃত্তের সেরা হাতিয়ার।

ফলে ধর্ম আর রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদেরই তৈরি নতুনপাঠ বা নতুন অর্থের শিকার আমরাই। ওপরতলার যাঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে 'ধর্মে'র নামে উসকে দেন, তাঁরা থাকেন নিরাপদে। প্রাণ যায় কেবল ওপরতলার উস্কানিতে উসকে-ওঠা সাধারণ নিরীহ গরিব মানুষের। রাজনৈতিক ফায়দা তোলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা উস্কানিদাতারা। এভাবেই এই উপমহাদেশের অবক্ষয়িত রাজনীতির ফল্গুধারা দিব্যি বহমান। একে রুধিবে এমন সাধ্য কার। আমরা তো আসলে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতেই অভ্যস্ত।

তাই তথাকথিত ধর্মের নামে মাতনে মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারায়। হারায় মানবিকতাবোধও। এমনকী, জীবনের সাধারণ ধর্মও। ভালোমন্দ বোধ হারায় ওই মাতনে। সুখে-দুঃখে, সংযোগ-বিচ্ছেদে, উৎসবে- অনুষ্ঠানে, ঘরের পাশে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করা অন্য ধর্মের নির্দোষ নিরপরাধ মানুষগুলি তখন রাতারাতি ভয়ানক শত্রু হয়ে ওঠে। তাঁরা নিজেরা কোনও অপরাধ না করলেও অপরাধী হয়ে ওঠেন। কিংবা অন্যের অপরাধের সামগ্রিক দায়দায়িত্ব তাদের কাঁধে এসে বর্তায়। এ কোন নষ্ট সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা?

যে কোনও ধর্মে বিশ্বাসী প্রকৃত ধার্মিক কখনও অন্য ধর্মের প্রতি কোনও রকম বিতৃষ্ণা কিংবা বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতে পারেন না। যে নিজের ধর্মের প্রতি প্রকৃতই নিষ্ঠ, সে অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও সহনশীল হতে বাধ্য। প্রকৃত ধর্মাচারণই এই প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দেয়। কিন্তু ক'জন আর ধর্মের প্রকৃত পাঠে সক্ষম? আমাদের সিংহভাগই তো অন্য ধর্ম তো দূরের কথা, নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেই একেবারে অজ্ঞ। ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় নিজেদের আত্মস্থ করে তুলেছি। সঠিক ধর্মাচারণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ঋদ্ধ করার সদর্থক প্রচেষ্টা কোথায়?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দনের কথায় ধর্ম হলো 'ত্যাগ, সংযম, সত্য আর ব্রহ্মচর্য।' তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, 'ধর্মের ভিত্তি নিঃস্বার্থপরতার উপর।...ধর্মজীবনের ভিত্তি ত্যাগের উপর স্থাপিত।' আজীবন তিনি তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ়চিত্তে পালন করে গেছেন এবং তাঁর সঙ্ঘের শিষ্যদেরও তা পালনে উৎসাহ জুগিয়েছেন। নিঃস্বার্থপরতা আর ত্যাগই যেখানে ধর্মের মূলকথা, সেখানে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান কোথায়?

অথচ ধর্মের ধ্বজাধ্বারী কিছু বিকৃত মানসিকতার মানুষ, কিছু ক্ষমতালোভী রাজনীতিক, অন্ধবিশ্বাস আর আবেগে ভর দিয়ে চলা কিছু নির্বোধ মানুষ এবং এরই পাশাপাশি কিছু গোঁড়া, ভণ্ড আর মৌলবাদী মানসিকতার মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত লাগামহীন তাণ্ডব- মাতনে,; ধর্ম আজ ধিক্কার আর ন্যক্করজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মানুষ আজ ধর্ম বলতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনর্থক বিদ্বেষ, সংঘাত আর হানাহানি বোঝে। এর বাইরে ধর্মকে দেখতে অনেকেই অভ্যস্ত নয়। এ বড়ো বেদনার, এ বড়ো যন্ত্রণার, এ বড়ো পরিতাপের কথা।

তাহলে প্রশ্ন, এর থেকে পরিত্রাণের পথ কী? অনেকেই হয়তো-বা বিজ্ঞের মতো বলবেন, ধর্মকে অস্বীকার করলেই মিটে গেল ব্যাপারটা। এ যেন মাথা ব্যথা হলে মাথাটাকেই কেটে বাদ দেবার অপরিণত পরামর্শ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, মাথাটাকে বাদ দিলে শুধু ধরটাকে নিয়ে চলা যাবে কি? না চলা সম্ভব? প্রাজ্ঞজনেরা বলবেন, মাথাটাকে বাদ দিয়ে নয়, মাথাটাকে রেখেই ব্যথার উপশম ঘটাতে হবে। কী সেই উপশমের উপাদান বা পথ তা আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান লুকিয়ে আছে কিন্তু সেখানেই।

সুতরাং যতদিন না ধর্মের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে, ততদিন আমাদের বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ-সহ প্রকৃত ধর্ম- ব্যাখ্যাকারদের যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। ধর্মহীন জীবনে ন্যায়-নৈতিকতার স্থান কোথায়? একই কথা রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। নিঃস্বার্থপরতা আর ত্যাগই যেখানে যদি সব ধর্মের মূলকথা হয়, সেখানে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান কোথায়? বলা বাহুল্য, রাজনীতির অবক্ষয় ও দুর্বৃত্তায়ন রুখতে গেলে প্রকৃত ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়াও পারেনি। ▮

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

চিঠিপত্র

প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করলে অনেক অসুবিধা হবে

বর্তমানে কোটি কোটি যুবক বেকারত্বের জ্বালায় যখন জীবিকার সন্ধান করে চলেছে ঠিক তখনই কোনো প্রকারে সামান্য আয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু যুবক সামান্য অর্থ উপার্জন করছিল তাদের আয়ের মূলে কুঠারাঘাত করে সরকার ও বহুজাতিক সংস্থা যে নির্দেশ জারি করেছে যাতে তারা চুরি ডাকাতিতে আসক্ত হয়। কথাটা হচ্ছে পলিব্যাগ, থার্মোকলের থালা-বাটি-গ্লাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করে প্রচার করে চলেছে ওইগুলি ক্রেতা বিক্রেতা যার হাতেই দেখা যাক না কেন তার পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও কঠোর শাস্তি হবে। অথচ এই সব নির্বোধরা একবারও যাচ্ছে না যেখানে ওগুলি প্রস্তুত হয়। কারণ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তো তাদের লক্ষ্মী। কারণ ভোটের আগে তাদের কাছে থেকে চাঁদা হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। সেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কী করে?

এতদিন ধরে তো পারেনি, এবার নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শাস্তির বিধান। তাহলে বলা যায় যে গ্লাসগুলিতে ঠাণ্ডা পানীয় স্টেশনে স্টেশনে বিক্রি করা হয় সেগুলির কী হবে আর যাবতীয় বিস্কুটের মোড়ক, চানাচুর, সেও, গাঠিয়া শুধু নয়, বর্তমানে দই, রসগোল্লা নেওয়ার পাত্রগুলিও তো পলিথিনের। সে ব্যাপারে কী হবে? এরপর আছে থার্মোকলের থালা-বাটি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা। স্থানীয় ভাবে কয়েকটি দোকান আছে যাদের একমাত্র ব্যবসা ওইগুলি বিক্রি করা। তারা কী করবে, তারা কি পেটে কিল মেরে থাকবে? শাসকশ্রেণীর এই তুঘলকি আইন প্রণয়ন করার কোনো মানে হয় না। এদের কার্যকলাপ হচ্ছে কাজ নেই তো খই বাছ।

তাহলে প্রশ্ন, এবার কি বিস্কুট ও চানাচুর তৈরি করা সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্যাকিং শালপাতার করবে, না কলাপাতায় করবে? পরিবেশবিদদের বক্তব্য কী? তাদের তো বেকারদের চাকরি দেবার কোনো ক্ষমতা নেই। তাহলে তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার কী অধিকার?

মিষ্টির দোকানে ১০০ বা ২০০ গ্রাম ওজনের দই পাতা হয় প্লাস্টিকের কাপে। তারপর ধরুন ২০০ গ্রাম বোঁদে কিংবা সন্দেশ নয়তো রসের মিষ্টি যেমন, রসগোল্লা, পান্তুয়া কিংবা রসমালাই এগুলি কি কাগজের ঠোঙায় দেবে? এই আইন হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার। এবার বছরের প্রথমদিন থেকে ধড়পাকড় শুরু হবে আর যারা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের কাজ করবে তাদের কিছু রোজগার করার সুযোগ করে দেওয়া আর কী!

আরও আছে। কাপড়ের দোকানে পলিব্যাগও তো দুষণের আওতায় পড়ে এবং ওই প্রকার দুষণের আওতায় পড়া বহু জিনিসের প্যাকিং আছে। সেগুলির কী হবে? সেগুলি কি কচুপাতায় দেওয়া হবে? আদতে সরকারি অনুগৃহীতদের রোজগারের একটা ব্যবস্থা করার জঘন্য এই ফিকির। কারণ হলফ করে বলা যায় এই পলিব্যাগ ব্যবহার করা থেকে প্রস্তুতকারক সংস্থাকে, খরিদ্দারকে দেওয়া থেকে দোকানদারকে কিছুতেই বিরত করতে পারবে না।

বলা হচ্ছে, ব্যাগ নিয়ে গিয়ে মাল কিনতে হবে। তাহলে রসগোল্লা ও দই কিনতে কি বাজারের ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে? না নলেন গুড় কিনতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে? কীরকম তুঘলকি চিন্তাধারা কে জানে?

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

আগুনে পুড়ে পোড়ামা নয়

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের সংখ্যায় জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়েরে লেখা 'নদীয়ার পরামায়া' নামে একটি প্রবন্ধ পড়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এসব আজগুবি লেখা কী করে স্বস্তিকায় প্রকাশ পায়? এর ফলে পরম্পরা নামে বিভাগটিকেই কলঙ্কিত করা হলো। নানা গল্প এক জায়গায় করা, গবেষণা কোথায়? এসবের তথ্যসূত্র কোথায়? পোড়ামা শব্দটি যদি পরামায়া শব্দের অপভ্রংশ হয় তাহলে তো বানান আলাদা হওয়ার কথা। ইতিহাস ভিত্তিক লেখাগুলি গবেষণাধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে তথ্য অনেকেই আছে। কোনো ভবন আগুনে পুড়ে পোড়ামা নয়, বিদগ্ধজনদের জননী, জ্ঞানের আগুনে দগ্ধ সেই অর্থে পোড়া। পড়ুয়াদের মা পোড়ামা। এই মায়ের পুজো নীল সরস্বতীর ধ্যানে পূজা হয়।

—নগেন্দু সাহা,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশের অতীত- বর্তমান প্রশ্নের মুখে

বলা হয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন। পরাধীন ভারতে একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল কংগ্রেস। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' এই নীতির ভিত্তিতে নেতাজী সুভাষের 'অখণ্ড ভারতের' স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তার জয়-পরাজয় আজ ইতিহাসের পাতায় ম্লান। গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। পরে ত্রিখণ্ডিত হলেও ধর্মীয় সমীকরণে দ্বিখণ্ডিত। কারণ মুসলমানদের পাকিস্তান এবং মুসলমানদেরই বাংলাদেশ। সে মর্মে হিন্দুদের হিন্দুস্থান হওয়া উচিত ছিল। এই সত্যটাকে আড়াল করতে গিয়ে হিন্দুদের 'হিন্দুত্ববাদী' বলে এমন ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যে হিন্দুরাই যেন সকল দোষে দোষী। গদির লোভে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল, আজও গদির লোভে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু জঙ্গি হানায় স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্ত থেকে বর্তমান পর্যন্ত অগণিত সেনা ও সাধারণ হিন্দুদের প্রাণ বলিদান হয়ে চলছে। প্রশ্ন জাগে, এর শেষ কোথায়?

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবেরহাট, কোচবিহার।

হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে যে তিমিরে ছিল বাংলাদেশেও সেই তিমিরেই

ধীরেন দেবনাথ

জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর যে ইসলামিক পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তার ছিল দুটি অংশ পূর্ব। পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। গোটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল একটি রাজ্য বা প্রদেশ। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চারটি রাজ্য বা প্রদেশ। যথা— পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হয় উর্দু। যদিও উর্দু কোনো রাজ্যের জনগণেরই মাতৃভাষা নয়। পঞ্জাবের পঞ্জাবি, সিন্ধুর সিন্ধি, বালুচিস্তানের বালুচ ও সীমান্ত প্রদেশের পুশতু এবং পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের বাংলা। মূলত পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ মাত্র। উর্দুভাষা পূর্ববঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত শুরু হয় যুদ্ধ।

৭১-এর ২৫ মার্চের মধ্যরাতে সশস্ত্র পাকসেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালির উপর। শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। শুরু হয় মুক্তি যুদ্ধ। গঠিত হয় গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেই সরকারের অনুরোধে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে অবতীর্ণ হয় মুক্তিযুদ্ধে। প্রায় দশমাসের দুর্বার লড়াইয়ের পর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। জেনারেল নিয়াজি তিরানব্বই হাজার পাকসেনা- সহ ঢাকায় যৌথ বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে করেন আত্মসমর্পণ। আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতালাভ, ভারত- বাংলাদেশ মৈত্রী ইত্যাদি সবই ঠিক এবং বাস্তব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কী? ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সৃষ্টিতে হিন্দুদেরও রয়েছে অবদান। তারাও রক্ত ঝরিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। ৭০ সালের নির্বাচনে পাক জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আওয়ামি লিগ। এই গরিষ্ঠতা লাভ কী শুধু হিন্দু ভোটে সম্ভব ছিল? তখন বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকাংশ মুসলমান বলতো, তারা আওয়ামি লিগে ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছে হিন্দুরা। তারা পাকিস্তানের পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধ চায় না। অর্থাৎ, বাংলাদেশ যুদ্ধের জন্য হিন্দুরা দায়ী। বাংলাদেশের চারটি মূলনীতির একটি হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। অথচ এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালীন সংবিধানে ঢোকানো হয়, বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কথাটি। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে হয়ে যায় ইসলামিক রাষ্ট্র। হাসিনা সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুধু ব্যাপকভাবে হিন্দু কবি, লেখকদের লেখাই শুধু বাদ দেওয়া হয়নি, হিন্দু গন্ধযুক্ত শব্দগুলিকে বাদ দিয়ে সেখানে ঢোকানো হয়েছে ইসলামিক শব্দ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দলীয় নেতা-মন্ত্রীরা সর্বদা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলেন, অথচ তাঁরাই আবার ভোটের স্বার্থে ইসলামিক দলকে জোটে নিচ্ছেন। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের নেতা-মন্ত্রীরাই সবচেয়ে বেশি হিন্দু-সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন এবং তাঁদেরই বাধায় হাসিনা সরকার আজও পাক সরকারের কুখ্যাত 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিল করতে পারেনি। ফলে বহু হিন্দুর সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। হাসিনা সরকারেরই কিছু অনৈতিক নীতিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্রকুমার সিনহা আইনসিদ্ধ করতে বা মান্যতা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দালাল, ঘুষখোর, বিরোধী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র সমর্থক, আর্থিক জালিয়াত ইত্যাদি অবমাননাকর অভিযোগ তুলে তাঁকে দেশ থেকে সরকার তাড়িয়েছে। অসাম্প্রদায়িক আওয়ামি সরকারের আমলেই বাংলাদেশে ঘটেছে বহু হিন্দু নির্যাতন, হিন্দুনারী অপহরণ, ধর্ষণ, হিন্দুদের সম্পত্তি জবর দখল, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত ইত্যাদি ঘটনা। ঘটছে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার নাসিরনগর, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, দিনাজপুরের ঠাকুর পাড়ার হিন্দুবাড়ি লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, মারধর, মন্দির ভাঙচুর ইত্যাদি সাম্প্রতিক ঘটনা হিন্দু উৎপীড়নের জ্বলন্ত উদাহরণ।

কাজেই পূর্বপাকিস্তানে মুসলমানরা হিন্দুদের উপরে যেভাবে অত্যাচার চালাত, দেশ ত্যাগে বাধ্য করত, স্বাধীন বাংলাদেশেও তাই চলছে। তাই হিন্দুরা পূর্বপাকিস্তানে ছিল যে তিমিরে, বাংলাদেশেও আছে সেই তিমিরেই। শহিদ দিবস, বাংলাভাষা দিবস, স্বাধীনতাযুদ্ধ, স্বাধীনতা দিবস ও ১৯৯৯ সালে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের হিন্দুদের মনে কোনো রেখাপাত করে না, করে না আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি। দেশভাগের সময় পূর্বপাকিস্তানে ছিল ২৯ শতাংশ হিন্দু। আর আজ মাত্র ৮ শতাংশ। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হবে হিন্দু শূন্য এবং বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হবে বাংলাদেশ।

শেখ মুজিবের অদূরদর্শিতা, রাজনৈতিক অপরিপক্কতা ও দেশশাসনে অবিচক্ষণতাই সপরিবারে তাঁকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর কন্যা হাসিনা সেই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে কিছুটা শিক্ষা নিলেও সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষায় তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সম্প্রতি নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা এই প্রশ্নই তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি একজনও নির্যাতিত হিন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছেন? তাদের মনে ভরসা জোগাতে পারছেন না। তাই বাংলাদেশের যে কোনো রাষ্ট্রীয় উৎসব হিন্দুদের কাছে বিবর্ণ, মূল্যহীন। ▮

পণপ্রথা বন্ধ করার উপায়

অঙ্গনা

ড. অপর্ণা দে

নারীবিরোধী কুপ্রথা বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত। এমন অনেক কুরীতি একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও সমান্তরাল ভাবে বিরাজমান। বহু মনীষীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু কুপ্রথা অবলুপ্ত হলেও পণপ্রথা আজও জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকে চেপে রয়েছে। আজও দেশের কোনো না কোনো গৃহবধূ পণের জন্য নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আজও বহু শিক্ষিত যুবক নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে 'পণ' প্রাপ্তির নিরিখে। বিয়ের প্রয়োজনীয়তা শুধু মেয়েদেরই রয়েছে তা নয়, পুরুষদেরও সমানভাবে রয়েছে। তাহলে শুধু মেয়েদের ওপরই বিয়ের মূল্যের বোঝা বহনের দায়িত্ব কেন থাকবে— একথা যুক্তি দিয়ে বিচার করার সময় এসেছে। দেশের যুব সমাজ বিশেষত যুবতীদের এর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে নিয়ে পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।



পণপ্রথা আজও সমাজে প্রকট ভাবে প্রচলিত থাকার কারণগুলি হলো ঃ (১) মেয়েদের প্রতি সমাজের হীন মনোভাব ও অবহেলা। কন্যাসন্তানকে অধিকাংশ মা-বাবা বোঝা স্বরূপ মনে করেন। (২) আত্মমর্যাদাহীন পুরুষদের শ্রমবিমুখতা। বহু আত্মমর্যাদাহীন যুবক বিনা পরিশ্রমে বিলাসবহুল জীবনযাপনে আগ্রহী। তারা নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে বিলাসদ্রব্য ক্রয় না করে বিয়ের পণ স্বরূপ টাকা ও জিনিসপত্রের দাবি করে বসে। (৩) কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা। (৪) মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধের অভাব। (৫) আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের পরনির্ভরতা। (৬) বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য। (৭) সামর্থ্যবান অভিভাবকদের কন্যার বিয়ের সময় উপহারের নামে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান। (৮) সামর্থ্যহীন অভিভাবকদের কন্যার জন্য ধনী পাত্র লাভের বাসনা। (৯) মেয়েদের সম্পত্তিহীনতা। ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের আগে পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমঅধিকার নিশ্চিত ছিল না। বর্তমান আইনে সমঅধিকার ঘোষিত হলেও এর প্রয়োগ তেমন ভাবে হচ্ছে না।

পণপ্রথা বন্ধ করার উপায় ঃ (১) মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা, সে যেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের ও পরিবারের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। (২) মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা, যেন সে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে সক্ষম হয়। (৩) পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের ভূমিকার ও অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া। (৪) ছেলে ও মেয়ে উভয়কে ছোটোবেলা থেকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মবিশ্বসী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। (৫) পণ নেওয়া যে ভিক্ষা চাওয়ার সমান এই বোধ ছেলেদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। (৬) পণ নেওয়া ও দেওয়া দুটোকেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সমাজের সবাইকে। (৭) পিতা-মাতার জীবিতকালে মেয়েদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা। (৮) সামাজিক কুসংস্কার ও কুশিক্ষা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে দূর করা।

পণপ্রথার সামাজিক প্রভাব ঃ (১) মেয়েদের মর্যাদার, ভূমিকার ও অবদানের অবমূল্যায়ন। (২) বিবাহ ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ। (৩) সমাজিক অবক্ষয়। (৪) সামাজিক ভারসাম্যের অবনমন। (৫) মহিলাদের বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা বৃদ্ধি। (৬) পণের দাবিদার পাত্রের সঙ্গে নিরুপায় কন্যাটি বিয়ে করতে বাধ্য হলেও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মায় না। এতে পরিবারের ভিত দুর্বল হয়। (৭) যুবকদের শ্রমবিমুখতা বৃদ্ধি পায়। (৮) কন্যাসন্তানের প্রতি অনীহা ও কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। (৯) মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার অভাব দেখা দেয়।

পণপ্রথা দূরীকরণে নারীশিক্ষার ভূমিকা ঃ শিক্ষা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখায়। আত্মনির্ভরশীল করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা গড়ে তোলে। নিজেকে চিনতে শেখায়। ভালো-মন্দের, উচিত-অনৌচিত্যের বোধ জাগ্রত করে। স্বনির্ভর করে।

পণপ্রথা সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়ের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এই সমাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আজকের যুবসমাজ বিশেষ করে যুবকদের পণপ্রথা বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে পণ নেওয়ার জন্য চাপ এলেও যুবকদের দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝাতে হবে যে, কন্যাটি পণের বিনিময়ে বিয়ে করতে রাজি হলেও স্বামী বা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা না জন্মে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা জন্মাবে।

মনে রাখতে হবে, সুন্দর দাম্পত্যজীবনের জন্য প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি এই অনুভূতিগুলি তৈরি না হলে সুখী দাম্পত্যজীবন সম্ভব নয়। তাই পণপথা বন্ধ করতে সকলকে এই কুপ্রথা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং নিজেদের জীবন থেকে এই ব্যাধি দূর করতে হবে। তবেই হয়তো পরবর্তী প্রজন্মকে পণপ্রথার অভিশাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। ■

যথাযথ শৌচক্রিয়ায় শরীর নির্মল হয়

অসিতবরণ আইচ

প্রথমত আমাদের জেনে রাখা ভালো শরীর যা-যা ত্যাগ করে তাকেই মল বলে। শুধু বিষ্ঠাই মল নয়। মূত্র, ঘাম, থুতু, কফ, চোখের পিচুটি, কানের খোল সবই মল অর্থাৎ শরীরের বর্জ্য পদার্থ। এখানে বিষ্ঠা ত্যাগ বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।

● মলের স্থান শরীরে নয়, শরীরের বাইরে। যত শীঘ্র সম্ভব শরীর যদি মলমুক্ত হয় ততই শরীরের সার্বিক মঙ্গল।

● খাদ্যের অসার পদার্থ থেকে মলের উৎপত্তি হলেও মল থেকেও শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।

● মলের স্বাভাবিক রঙ হলুদ। খাদ্য বা ওষুধের কারণে অন্য রঙেরও মল হয়।

● পাকাকলার মতো লম্বা অথচ নরম মলই স্বাভাবিক।

● অতি পাতলা বা অতি শক্ত মল ব্যাধির লক্ষণ।

● বেশি কোঁত দিয়ে মলত্যাগ করা ভালো নয়। প্রয়োজনে পরে আবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

● যখন মলের বেগ আসবে তখনই মল ত্যাগ করা উচিত। মলের বেগ ধারণ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

● ক'বার? যত বারে পেট পরিষ্কার হয় ততবার। কম করে দুইবার।

● জল খেয়ে পায়খানায় যাওয়া উচিত; পায়খানার পর জল খাওয়া নয়।

● খুব পাতলা পায়খানা হলে সঙ্গে সঙ্গে জল খাওয়া উচিত।

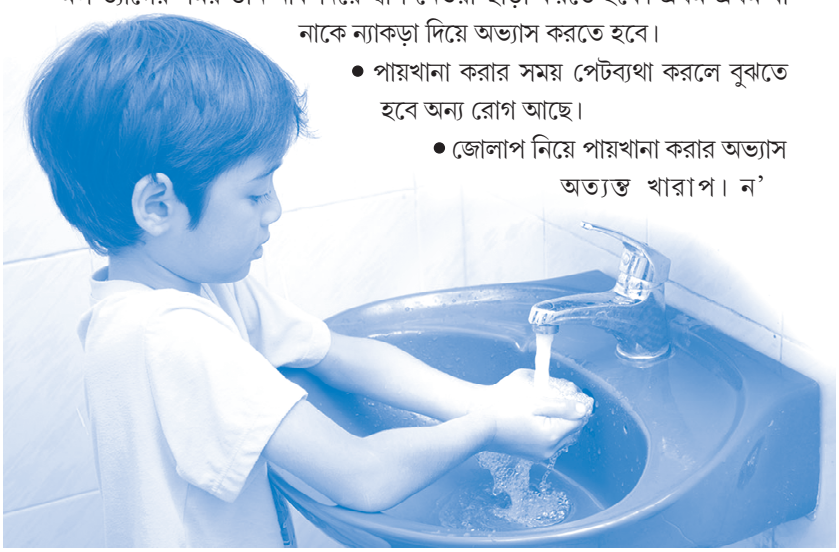
● শারীরিক অসুবিধা না থাকলে কমোড ব্যবহার না করে, হাঁটু ভেঙে ভারতীয় ভঙ্গিমাতেই পায়খানা করতে হবে।

● পায়ের কাপ-মাসেলে থাইয়ের নীচের অংশের চাপে মল ও মূত্রভাণ্ড পরিষ্কার হয়।

● একটানা পায়খানায় না বসে মাঝে এক মিনিট দাঁড়িয়ে দুটো হাত দিয়ে থাই ধরে থাকলে পরে বেশি মল নিঃসরণ হবে।

● মলদ্বারে সরষের তেল বা নারকেল তেল বা দেশি ঘি বা মধু দিলে মল সহজে নির্গত হয় এবং অর্শ থেকে রেহাই মেলে।

● মল ত্যাগের সময় ডান নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া-ছাড়া করতে হবে। প্রথম প্রথম বাঁ নাকে ন্যাকড়া দিয়ে অভ্যাস করতে হবে।



● পায়খানা করার সময় পেটব্যথা করলে বুঝতে হবে অন্য রোগ আছে।

● জোলাপ নিয়ে পায়খানা করার অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ন'



মাসে ছ'মাসে এক-আধ দিন নেওয়া যেতে পারে।

● জলশৌচ করার সময় মসৃণ নখের মধ্যমা তৈলাক্ত কিছু লাগিয়ে মলদ্বারে এক-দেড় ইঞ্চি ঢুকিয়ে পাঁচবার পরিষ্কার করতে হবে। এর ফলে অর্শসহ অনেক কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

● পায়খানা করাকালীন পুরুষদের অণ্ডকোষ দুটো উঁচু করে তুলে রাখতে হবে, যেন ঝুলে না থাকে।

● মলত্যাগের সময় দাঁতে-দাঁত চেপে রাখতে হয়। খুব জোরে নয়। এতে দাঁত ভালো থাকে।

● মলদ্বারের দিকে তাকিয়ে মলত্যাগ করতে নেই, এতে মেরুদণ্ডের ক্ষতি হয়।

● পায়খানার পরিচ্ছন্নতার উপর অনেকটা নির্ভর করে পেট পরিষ্কার হওয়া। পরিবেশ দুর্গন্ধমুক্ত হলে, স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে মল নিঃসরণ ভালো হয়।

● খোলা আকাশে মলত্যাগ ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

● বাম হাতেই জলশৌচ করা বিধেয়। মল ত্যাগের পর স্নান করতে পারলে ভালো; নইলে হাত-পা-মুখ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

● কোনো কাগজ বা কাপড় নয়, জল থাকলে জল দিয়েই শৌচক্রিয়া সারতে হবে। পরিষ্কার মলদ্বার সুস্থ দেহের ভিত্তি।

● বেগ আসুক বা না আসুক সকালে ঘুম থেকে উঠে উষাপান করে পায়খানায় যেতে হয়। মল নিঃসরণ না হলেও শরীর হালকা হবে।

ভারতীয়ত্ব প্রশ্নের মুখে
মানুষ জবাব দেবে হয় বুলেটে, নয় ব্যালটে

সনাতন রায়

আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ইন্ডিয়া টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'আজ কি আদালত'-এর কাঠগড়ায় বসে সেদিন রজত শর্মার চাঁছাছোলা প্রশ্নের উত্তরে মোদী বলেছিলেন— মুম্বইয়ে পাক- সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় যদি আপনি দায়িত্বে থাকতেন, আপনি কী করতে পারতেন? মোদীর সাফ উত্তর ছিল—"গুজরাটে যা করেছিলাম সেটাই করতাম। ব্যবস্থা নিতে আমার কোনো সময়ই লাগত না। আমি আজও বলছি, পাকিস্তানকে ওদের নিজেদের ভাষাতেই জবাব দিতে হবে। লাভ লেটার লেখা বন্ধ হওয়া দরকার! প্রণব মুখার্জি বার বার চিঠি দিচ্ছেন আর ওরা জবাব দিয়ে যাচ্ছে। অপরাধ ওরা করছে আর ভারত সরকার তার জবাব দিচ্ছে।" আন্তর্জাতিক চাপের প্রসঙ্গ উঠলে মোদীর জবাব ছিল—"আন্তর্জাতিক চাপ! ভারতবর্ষ ১০০ কোটি মানুষের দেশ। ইচ্ছে করলে আমরা গোটা পৃথিবীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি। আমাদের ওপর চাপ তৈরি করবে কে? এ তো দেখছি গঙ্গার স্রোত উল্টোদিকে বইছে। পাকিস্তান আমাদের ওপর হামলা করল। আমাদের মেরে চলে গেল। আর আমাদের মন্ত্রী কী করলেন? আমেরিকায় গিয়ে 'ওবামা, ওবামা আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও' করে কান্না জুড়ে বসলেন। এটা কোনো কথা হলো? প্রতিবেশী দেশ তোমায় মেরে গেল, আর তুমি চলে গেলে আমেরিকায়। আরে ভাই, পাকিস্তানে যাও না। সোজা কথা, পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষা বুঝিয়ে দিতে হবে। রাস্তা একটাই।"

সাল ২০১৯। ১৪ ফেব্রুয়ারি, জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাক সন্ত্রাসবাদীরা কেড়ে নিল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের ৪০ জন জওয়ানের দেশপ্রেমী জীবন। তাদের কোনও অপরাধ ছিল না।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী দশ বছর আগে যা বলেছিলেন, তাই করে দেখালেন। পাক হামলার পরদিনই ঘোষণা করে দিলেন— পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য দেশের সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। তাঁরা যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তাই নেবেন।

আর দশ দিনের মাথায় ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বারোটি বিমান পাকিস্তানের সীমারেখা ভেদ করে বোমাবর্ষণ করে গুঁড়িয়ে দিল বালাকোট, মুজফফরাবাদ ও চাকোটির সবচেয়ে বড়ো জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি। নিকেশ হলো পাক সন্ত্রাসবাদের নাটের গুরু মাসুদ আজাহারের শ্যালক ইউসুফ আজাহার ওরফে উস্তাদ ঘাউড়ি, মাসুদের তুতোভাই মওলানা তলহা সইফ, মওলানা আমের, মুফত আজাহার খান ওরফে খান কাশ্মীরি আর ইব্রাহিম আজাহারের মতো কুখ্যাত জঙ্গি নেতা ও প্রশিক্ষকরা। মাত্র ২১ মিনিটেই পাকিস্তানকে তাদের ভাষাতেই বুঝিয়ে দিলেন মোদীজী— হামলার জবাব হামলাতেই শেষ হবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভারত যুদ্ধের পথে এগোতেও দ্বিধা করবে না।

দশ বছর আগে বলেছিলেন— শ' কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ চাপ-সৃষ্টি করবে গোটা বিশ্বের ওপর। পুলওয়ামা ঘটনার মাত্র ৩/৪ দিনের মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৃহৎ শক্তি (একমাত্র চীন ছাড়া) ভারতবর্ষের পাশে



ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতের পথে উইং কমান্ডার অভিনন্দন।

এসে দাঁড়াল। একযোগে নিন্দাধ্বনি প্রয়োগ করল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের একমাত্র বন্ধু চীনও শেষ পর্যন্ত চীনের মাটিতে বসেই রাশিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে পাক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের সঙ্গে গলা মেলাতে বাধ্য হয়েছে। মোদীজী দশ বছর আগের দেওয়া কথা যে শুধুমাত্র ভাষণ ছিল না, তার প্রমাণ রেখেছেন। আগামীদিনেও যে তিনি প্রয়োজনে কঠোর হতে দ্বিধা করবেন না তাও বলেছেন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের চুরুর জনসভায়। বলেছেন—

সৌগন্ধ মুঝে ইস মিট্টি কি
ম্যায় দেশ নহি মিটনে দুঙ্গা
ম্যায় দেশ নহি রুখনে দুঙ্গা
ম্যায় দেশ নহি ঝুঁকনে দুঙ্গা।

নিজের জোড় হাত জনগণের সামনে তুলে ধরে শপথ নিয়েছেন, মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছেন— 'দেশ ইস হাত মে সুরক্ষিত হ্যায়।' না, মোদীজীকে আমেরিকায় গিয়ে চোখের জল ফেলতে হয়নি। দেশের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, মোদীজী মোদীজীই। ভারতের ইতিহাসে এক অন্য ধাতুতে গড়া চরিত্র।

১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধের পর পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে এত বড়ো পদক্ষেপ আর কেউ নেননি। যদিও গত ৪৭ বছরে পাকিস্তান ভয়াবহ রকমের সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে একের পর এক। শয়ে শয়ে নিরীহ ভারতবাসীর প্রাণ গিয়েছে বিনা অপরাধে। গোটা বিশ্ববাসীর সামনে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার সামর্থ্য কত দুর্বল, তা প্রমাণ করে দিয়েছে পাকিস্তান। অপমানে অপমানে ভারত জর্জরিত হয়েছে কিন্তু ঠিক এইভাবে, মোদীজী যেভাবে গোটা বিশ্বের ওপর চাপ তৈরি করে বিশ্বকে বলতে বাধ্য করেছেন যে, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র, সন্ত্রাসবাদের মদত দানকারী রাষ্ট্র। তেমন কোনো নজির এর আগে কোনো সরকারই রাখতে পারেননি। একমাত্র আগের বিজেপি সরকার ছাড়া যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী যিনি পোখরানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করে পাকিস্তানকে সমঝে দিয়েছিলেন— রক্তচক্ষু দেখিও না। প্রয়োজনে তোমার গোটা পাকিস্তানকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব নিমেষে।

তবে দেশটার নাম তো ভারতবর্ষ। তার ওপর প্রধানমন্ত্রী পদে রয়েছেন এ তাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী। বিরোধীদের গায়ের জ্বালা তো ধরবেই। তাই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছেন হামলার পরদিন থেকেই— (১) বিজেপি ক্ষমতায় এলেই যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির ওঠে কেন? (২) যুদ্ধ শুরু কি ভোটের তাগিদেই? (৩) পুলওয়ামা হামলার পিছনে কি পাক সন্ত্রাসবাদীরাই, নাকি রক্ত ঝরানোর পিছনে ছিল সরকারি পরিকল্পনাও? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীজীর বড়ো বিরোধী তিনি শুধু সেনাবিদ্রোহে উস্কানি দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। প্রায় সরাসরি পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন, পাকিস্তান হামলা করেছে, তার প্রমাণ কী?

এক এক করে প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্ন, বিজেপি সরকারে বসলেই যুদ্ধ যুদ্ধ রব ওঠে। কেন? বিরোধীদের এই পর্যবেক্ষণ মিথ্যে নয়। ১৯৯৯ সালে বিজেপি সরকারের আমলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল। ২০১৯-এও যুদ্ধ যুদ্ধ রব। আসলে এর কারণ যে বিরোধীরা নিজেরাই তা জেনেও তাঁরা ভালোমানুষ সেজে থাকেন। বিরোধীরা ধর্মনিরপেক্ষতার বোরখা পরে পাকিস্তানের বন্ধু সেজে থাকেন। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেন মুসলমান ভোট আদায় করে। আর পাকিস্তানকে বার্তা পাঠাতে থাকেন— আমরা তোমার পাশে আছি। বেআইনি অনুপ্রবেশ চলুক। দেশের মধ্যে যত খুশি মাদ্রাসা, মসজিদ গড়ে তোলো। গড়ে তোলো সন্ত্রাসবাদ প্রশিক্ষণ শিবির। মানবতাবাদের চাদর জড়িয়ে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার নামে এই বিরোধীরাই আমন্ত্রণ জানায় সন্ত্রাসবাদীদের। কারণ ভোট বড়ো বালাই। স্বাধীনতার পর থেকে সবচেয়ে বেশি সময় দেশ শাসন করেছে যে সব বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল, তারা শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে জাতীয়তাবোধ নামক আবেগটাকেই বেচে দিয়েছে পাক সরকার এবং পাক সরকারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের কাছে। তাই তাদের শাসনকালে হামলা হয় কম। যুদ্ধ যুদ্ধ রব ওঠে কম।

কিন্তু বিজেপি যে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সংগঠন। তার ওপর প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী যিনি বিনা আমন্ত্রণেই পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের জন্মদিনে হাজির হয়ে যেতে পারেন দুঃসাহসে ভর করে। যিনি গোটা বিশ্ব চষে বেড়ান গোটা বিশ্বের সামনে ভারতবর্ষকে তুলে ধরতে। যিনি প্রয়োজনে গোটা বিশ্বের সমর্থন ও সম্মান আদায় করে নিতে পারেন। যিনি ভারতবর্ষকে উদ্বেলিত করেন জাতীয়তাবাদের আবেগে নতুন করে। যিনি নিজেকে হিন্দু বলতে ভয় পান না কিন্তু যিনি মুসলমান বিরোধী নন, যিনি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। যাঁর কাছে রাষ্ট্রের চেয়ে বড়ো কিছু নয় বলেই উন্মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারেন— ''মেরা বচন হ্যায় ভারত মাকো/তেরা শির ঝুঁকনে নহি দুঙ্গা/হম ফিরসে দোহরানা চাহাতা হ্যায়/আউর খুদকো ইয়াদ দিলানা হ্যায়/না ঝুঁকেঙ্গে না হটেঙ্গে/কুছ ভি হো হম দেশ কো নহি মিটনে দেঙ্গে।'' এরকম একটা মানুষকে পাকিস্তানই বা সহ্য করবে কেমন করে? বিরোধীরাই বা সইবে কীভাবে? অতএব পাক-হামলার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি অস্থির হয়। সরকার পাল্টা আঘাত হানে একথা প্রমাণ করতে— ভারতবর্ষ দুর্বল নয়। ১৩০ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা হানা দেবেই। যুদ্ধ যুদ্ধ রব ওঠে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। বরং এ রব গর্বের। কারণ এর জন্য বিশ্বের দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করতে হচ্ছে না কাউকে।

যুদ্ধ শুরু কি আসন্ন ভোটের তাগিদেই?

বিরোধীরা সেটাই মনে করছেন। কারণ গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ বেশ কয়েকটি লেজুড় দলবল জোটের নামে ঘোঁট পাকিয়ে আওয়াজ তুলেছে— '২০১৯, বিজেপি ফিনিশ!' কারণ মোদীর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েছে। কারণ মোদী দেশশাসনে ব্যর্থ। কারণ মোদীর আমলে সবচেয়ে বেশি চাষি আত্মহত্যা করেছেন। কারণ মোদীর আমলে নোটবন্দি হয়েছে। কারণ মোদীর আমলে জিএসটি চালু হয়েছে। কারণ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে।

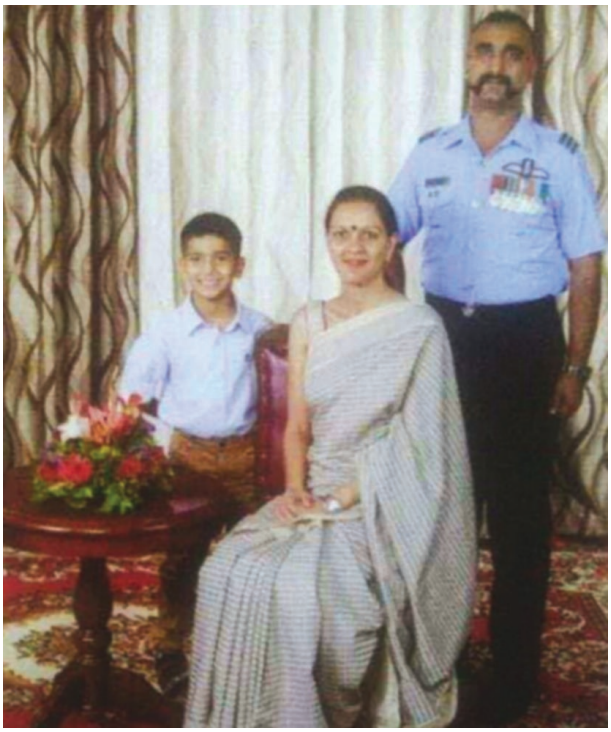
বেশ। ভালো কথা। তাঁদের যুক্তি, হারিয়ে ফেলা জনপ্রিয়তার পুনরুদ্ধারেই মোদীর এই যুদ্ধ প্রয়াস।

মাননীয় বিরোধীদের বলব— একটু পিছন ফিরে তাকান। ১৯৯৯ সাল। দেশে বিজেপি সরকার। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভোটের তিনমাস আগে হয়েছিল কার্গিল যুদ্ধ। ভোটের পর বিজেপি পেল ১৮২টি আসন। ১৯৯৮-এর ভোটের চেয়ে একটা আসন বেশিও নয়, একটি আসন কমও নয়। বরং সব মিলিয়ে বিজেপির ভোট কমেছিল ২ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে নিজস্ব আসন ৫৭ থেকে কমে হয়েছিল ২৯। কর্ণাটকে কমেছিল ৬টি আসন। পঞ্জাবে নিজস্ব জয় ৩ থেকে কমে হয়েছিল ১। ভোট কমেছিল ২.৫ শতাংশ। এই ফলাফল কি প্রমাণ করে, যুদ্ধ বিজেপিকে বেশি ভোট, বেশি জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল?

আরও একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ১৯৬২ সাল। সংসদে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ছিল ৩৬১। ১৯৬৫ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হলো। ভোট হলো ১৯৬৭-তে। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে হলো ২৮৩। ভোট কমল সব মিলিয়ে ৪ শতাংশেরও বেশি। যুদ্ধ যুদ্ধ রব যে ভোট বাড়ায় না, জনপ্রিয়তাও বাড়ায় না, এটা আরও একটা প্রমাণ। কারণ যুদ্ধে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ে বেশি। দেশ আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। অতএব যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ হারিয়ে বলছেন, সেনা জওয়ানদের রক্তের হোলি খেলে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছেন মোদীজী, যখন অন্যান্য বিরোধী দল পাকিস্তানকে নিন্দামন্দ করলেও, মোদীকেই দায়ী করেছেন এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য, তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে— আসলে তাঁরা মোদীর জনপ্রিয়তাকে ভয় পাচ্ছেন। আসলে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, একদিকে চাণক্য সুলভ রাজনীতি, অন্যদিকে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণার দীপ জ্বালিয়ে মোদীজী সব বিরোধী শক্তিকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। শুধু সামান্য ভোটের ব্যবধানে বা আসনের ব্যবধানে রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশের বিজেপির পরাজয়কে আইকন হিসেবে খাড়া করে জিএসটি এবং নোটবন্দি নীতির রূপায়ণের সাফল্যকে ম্লান করা যাবে না। ধামাচাপা দেওয়া যাবে না গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সাফল্যকে এবং তাঁরা নিজেরাই যত বেশি করে সংখ্যালঘুদের দাবার চালে বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করবেন, সংখ্যাগুরু বোড়ের সংখ্যা রাজা মোদীকে ততবেশি করেই ফিরে



উইং কমান্ডার অভিনন্দনের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকিস্তানী এফ-১৬।



সপরিবারে উইং কমান্ডার অভিনন্দন।

থাকবে ভোটবাক্সে। কারণ মোদী আজ ভারতীয় তথা হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

তৃতীয় প্রশ্নটা তুলেছেন, এই মুহূর্তে যিনি দিল্লির মসনদ দখলের আশায় হাওয়াই চটি পরা পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, পুলওয়ামা ঘটনার পিছনে পাকিস্তান দায়ী, তার প্রমাণ কোথায়? নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটির অজুহাত তুলে তিনি হামলার দায় মোদীর ঘাড়েই চাপাতে চাইছেন এবং পরিষ্কার বলছেন, মোদীজী সেনার রক্তে হোলি খেলে রাজনৈতিক বাজিমাত করতে চাইছেন। অতি বড়ো মূর্খও মানে, ভারত যখন হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করছে, তখন গোটা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের দিকে। বিনা প্রমাণে ভারতবর্ষ যে একথা বলেনি সেটা একটা শিশুও বুঝবে। বুঝবেন না শুধু মমতাজী যিনি নিজেকে পরম মুসলমান হিতৌ ষী প্রমাণ করতে গিয়ে এতবেশি মুসলমান ম্যানিয়াক হয়ে উঠেন যে মুসলমানদের কাছেই তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন। তিনি বোঝেন না, অতি চালাকের গলাতেই দড়ির বাঁধন পড়ে। মূর্খের গলায় নয়।

গত কয়েকদিন ধরে ফেসবুক এবং ট্যুইটারেও বেশ সরব 'বন্ধুরা'। বেশিরভাগ সমর্থনটা যখন পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির নিকেশ করার পক্ষে এবং দেশবাসীর সবচেয়ে বড়ো অংশটা যখন সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সর্বতোভাবে মদত দিয়ে থাকেন, অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন, তখন কিন্তু মমতাদির কণ্ঠ রুদ্ধ। সেনাবাহিনীর জওয়ানদের জন্য তিনি অনুপ্রেরণার বাক্স খুলতে রাজি নন। বরং তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা যাঁদের মূর্খতা মূর্খামির সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়, তারা প্রশ্ন তুলছেন— বালাকোট,

মুজফফরাবাদ আর চাকোটিতে যে জঙ্গি শিবির ধ্বংস হয়েছে, তার প্রমাণ কী? কোনো ছবি বা ভিডিও তো পাইনি। বরং উল্টো তাঁরা একটি ভিডিও প্রচার করছেন তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে যা পাকিস্তানে জঙ্গি শিবির ধ্বংসের আগের দিনে তোলা। অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তার রূপবর্ণনা। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে! তাঁরা এটাও বোঝেন না যে, এখন ভারত কেন, কোনো দেশই এরকম পরিস্থিতিতে মিথ্যা প্রচার চালাতে পারে না। কারণ উপগ্রহের দৌলতে গোটা বিশ্ব জানে, প্রয়োজনে আপনার আমার বেডরুমের ছবিও তারা দেখিয়ে দেবে। আর সেখানে নাকি মিথ্যা প্রচার করবে ভারতবর্ষ! দিদির অনুগামীদের গুণের শেষ নেই!

যাক সে কথা। আসা যাক অন্য কথায়।

পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন প্রাক্তন পাক-ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরান খান। সুদর্শন এবং সুবক্তা, পাকিস্তান তহরিক-ই-ইনসাফ দলের সর্বাধিনায়ক কী চাইছেন? তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, নরেন্দ্রদামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে পাঙ্গা লড়া মানে জীবনকে হাতের মুঠোয় রেখে বাজি লড়া। কারণ, লোকবল এবং সামরিক বল— দুটোতেই ভারত অনেক এগিয়ে। তার ওপর আছে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় সমস্ত বড়ো দেশের সমর্থন যা মোদীজী গত পাঁচ বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন বিশ্ব পরিক্রমা করে। যা বিরোধী দলগুলি এমনকী পাকিস্তানও অনুমান করতে পারেনি। অতএব ইমরান বোঝেন, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়েই বাঁচতে হবে। একেবারে শুরু থেকেই নিতান্ত অশিক্ষায় পরিপূর্ণ জেদের বশে পাকিস্তান ভারতবর্ষকে প্রথম এবং একমাত্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে যে লড়াইটা লড়ে চলেছে তা যে দেশের মধ্যেই অজস্র ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের জন্ম দিয়েছে, তা অতীতের বেনজির ভুট্টো ছাড়া কোনো প্রধানমন্ত্রীই বোঝেননি। তার ফল হয়েছে একের পর এক প্রধানমন্ত্রীর হত্যা। তা নইলে স্বাধীনতার ৭২ বছরে ২২টা প্রধানমন্ত্রী হয় একটা দেশে! ইমরান খান বোঝেন, গোটা দেশটা চলে গেছে সন্ত্রাসবাদীদের দখলে। সন্ত্রাসবাদী মানে এক একটি সন্ত্রাসবাদী পরিবারের হাতে যারা সন্ত্রাসবাদী কোম্পানি খুলে বসে গোটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এবং সরকারকে বাধ্য করে তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলতে। চললে ভালো। নইলে ধড়, মুণ্ড আলাদা হতে দেরি হবে না। মনে পড়ে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী জিয়াউল হকের মৃত্যুর কথা। প্লেনসমেত তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এমনভাবে যে শেষ পর্যন্ত দাঁতের পাটি দেখে বোঝা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী খতম। ইমরান খানের রাজনীতিতে প্রবেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর তখতে আসীন হওয়ার পিছনেও রয়েছে জনগণের ভোট নয়, সন্ত্রাসবাদীদের মদত। তিনি চুক্তিবদ্ধ—সন্ত্রাসবাদীরাই দেশ শাসক। তিনি ড্রাইভার মাত্র।

ইমরান খান এখন এগোলেও বিপদ— কারণ ভারত যুদ্ধের জন্য তৈরি। পিছোলেও বিপদ— পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ আজাহার। তার ওপর আছে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সুস্থ প্রশাসনের দাবি। কারণ তারা সুখে শান্তিতে বাঁচতে চায়। তারা চায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পের প্রগতি। শুধু ইসলামের নামে নাড়া দিয়ে যে জীবন এগোয় না, তাঁরা তা বোঝেন। তাঁরাও চাইছেন— পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি বদলাক।

ইতিমধ্যেই ইমরান খান দু' দু-বার আলোচনার প্রস্তাব রেখেছেন। বোঝা যাচ্ছে, তিনি রফায় আসতে চাইছেন। কিন্তু একবারও বলছেন না, মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁকে ফাঁসি দেব। একবারও বলছেন না, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। কারণ তাঁর মাথায় কালাশনিকভ ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ আজাহার স্বয়ং। এমতাবস্থায় ইমরান খান কী করবেন?

তিনি যদি সত্যিই চান, পাকিস্তান পরিণত হোক একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রে, তাহলে তাঁকে আন্তর্জাতিক দেশগুলির মতামতে সায় দিতে হবে। অবশ্য ২/১টি দেশ ছাড়া যারা চায় পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে খাড়া করে রেখে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে। আর যদি তা না চান, তাহলে তাঁকে ভারতের সঙ্গে মোকাবিলায় নামতে হবে। হয় সরাসরি সামরিক ময়দানে, নয় কূটনৈতিক মোকাবিলায়। তার জন্য ভারত প্রস্তুত। প্রস্তুত মোদীজী। এখন প্রশ্ন হলো— ভারতবর্ষের বিরোধীদের অবস্থান কী হবে? তাঁরা কি মোদীর সঙ্গে অযৌক্তিক বিরোধিতাতেই মেতে থাকবেন? নাকি আক্ষরিক অর্থে যৌক্তিক বিরোধিতার পথে এগোবেন? এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিরোধীরা, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিজেপির নেতৃত্বের স্তরে অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী, নীতীন গড়কড়ি বা অরুণ জেটলিদের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টির রাজনীতি করছেন, তা যে আসলে মূর্খের মুখে চপেটাঘাত হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। জোটের নামে যে ঘোঁট তৈরির চেষ্টা চলছে, তাও যে ব্যর্থ হবে, তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। এমনতাবস্থায় বিরোধীদের একটা সুস্থ অবস্থান নেওয়াই মঙ্গলের। পাকিস্তানের সহমর্মী হয়ে ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে গেলে ফলটা যে উলটপুরাণ হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সব প্রশ্নের শেষেও মূল প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে— চলতি পরিস্থিতি কি বিজেপিকে আরও অনুকূল পরিস্থিতি এনে দেবে?

এ প্রশ্নের উত্তর একটাই— কোনো প্রতিফলের আশায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি বিজেপি। পাক-হামলার পিছনে বিজেপির কোনো চক্রান্ত ছিল না। চক্রান্তটা ছিল পাকিস্তানের, পাক- সন্ত্রাসবাদীদের। সুতরাং বিজেপি কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী কোনো কিছুর আশা করে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেননি দেশকে। এমনকী, এমন আশাও করেননি যে, যুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধের আবেগে ধোঁয়া দিয়ে উত্তপ্ত করে ভারতবাসীর হৃদয়সম্রাট হয়ে জিইয়ে রাখতে চান নিজেকে। ভোট নয়, মোদীজী চান— ভারতের জাতীয়তাবোধ, সাহস, শৌর্য, ঐতিহ্য আর পরম্পরাকে জাগরুক করতে। পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিতে— সন্ত্রাসী রাষ্ট্রনীতি নিয়ে হিন্দুত্বের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ভারতীয়ত্বর আর এক নাম হিন্দুত্ব যা বিস্মৃতপ্রায় যুগ থেকে চিরভাস্বর। কোনও রাজনীতি, কোনও রাষ্ট্রনীতি, কোনও সন্ত্রাসবাদ বা পররাষ্ট্রীয় চাপ সেই হিন্দুত্বকে মুছে দিতে পারবে না।

দেশর সেই জাতীয়তাবোধ, সেই হিন্দুত্ববোধ যদি পরীক্ষার মুখে দাঁড়ায়, দেশের মানুষই এর জবাব দেবে। হয় বুলেটে, নয় ব্যালটে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে মোদীর রাজনৈতিক সদিচ্ছার জয়

চন্দ্রভানু ঘোষাল

পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন জইশ-ই-মহম্মদের শিকড় উপড়ে ফেলবেন। ভারতীয় বায়ুসেনার বিধ্বংসী অভিযানের পর মানতেই হবে তিনি কথা রেখেছেন। তিনটি জঙ্গিশিবির তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস এবং তিন শতাধিক জঙ্গির মৃত্যুর পর জইশ যে বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। সেইসঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া গেছে, ভারত যদি যুদ্ধ করা মনস্থ করে তাহলে যে কোনও দিন—যে কোনও মুহূর্তে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যুদ্ধে পাকিস্তানকে হাজারবার হারালেও কি কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হবে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর, না, হবে না। যতদিন না দেশের মধ্যে ইতস্তত গজিয়ে ওঠা পাকিস্তান এবং পাকিস্তানপ্রেমীদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ততদিন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ পাকিস্তানপন্থীরা যাতে অবাধে প্যান-ইসলামিক অ্যাজেন্ডার বাস্তবায়ন করতে পারেন তার জন্যেই কাশ্মীরে অশান্তি জিইয়ে রাখা জরুরি।

এটা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, কাশ্মীর সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ঘটনা। প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধে ভারত জয়ী হলেও কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের দখলে চলে যায়। জওহরলাল নেহরু চাইলে পাকিস্তানের সেনা হটিয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে আবার ভারতের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তার সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল না। কালক্রমে কাশ্মীরের ওই অংশ পাক অধিকৃত কাশ্মীর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এবং কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, তার মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। পাক সেনা কাশ্মীরের একাংশ দখল করার পর নেহরু বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যান এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। বস্তুত নেহরুই ভারতের মেরুদণ্ডহীন পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতা। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অন্য প্রধানমন্ত্রীরাও নেহরুর পররাষ্ট্রনীতিকে অনুসরণ করেছেন। কেউই অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে পাক সেনাদের হটিয়ে কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করার চেষ্টা করেননি। তাদের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব একটা বড়ো কারণ। তারা জানতেন কাশ্মীরে সমস্যা থাকলেই ইসলামিক সন্ত্রাস থাকবে। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবার নামে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে। হিন্দুরাও সন্ত্রাসের আতঙ্কে চাপে থাকবে এবং ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির সহজ শিকার হয়ে কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অবাধ মুসলমান তোষণ দেখে এ কথা মনে হতেই পারে এই তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল প্যান ইসলামিক অ্যাজেন্ডার অঙ্গ হিসেবে। অন্তত এমনটা যারা ভাবেন তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতা নামক জোয়ালটি কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই হিন্দুরা দুর্বল হয়েছে এবং মুসলমানরা শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি শক্তিশালী হয়েছে পরিবারতন্ত্র এবং আঞ্চলিক রাজনীতির নামে ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই।

পুলওয়ামা পরবর্তী নরেন্দ্র মোদীকে বিচার করতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে। সি আর পি এফ জওয়ানদের বাসে জঙ্গি হামলা হবার পর তিনি বলেছিলেন জইশ-ই-মহম্মদের শেকড় উপড়ে ফেলা হবে। দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকার নরেন্দ্র মোদীর ফাঁকা বুলি নয়। জইশকে উপযুক্ত জবাব দেবার মতো সাহস এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা তাঁর আছে। এর আগেও তিনি সার্জিকাল স্ট্রাইক করেছেন। সেবার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একাধিক জঙ্গি লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করে অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছিলেন ভারতীয় কম্যান্ডোরা। সুতরাং নরেন্দ্র মোদী নিশ্চয়ই পুলওয়ামারও প্রতিশোধ নেবেন। তিনি কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী নন। দেশের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক হারাবার ভয়ে বৃহন্নলাবৃত্তি অবলম্বন করার কথা তিনি স্বপ্নেও ঠাঁই দেবেন না। কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, মোদী তো সব দায় সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এটা কি পাশ কাটানো হলো না? না, হলো না। সেনাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাদের মাথার ওপর থেকে রাজনৈতিক চাপ সরিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো, দেশের মানুষ ঠিক যেমনটি চান, তিনিও চান সেইরকমই। ৪০ জন জওয়ান খুন হওয়ায় তার বুকেও শোকের আগুন জ্বলছে। তিনি চান সেনাবাহিনী উপযুক্ত জবাব দিক। উপড়ে ফেলুক জইশের শেকড়। এর আগে অটলবিহারী বাজপেয়ী ছাড়া অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী বা



পাকিস্তান থেকে ফেরার পর দিল্লির হাসপাতালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সিতারামনের সঙ্গে অভিনন্দন।

রাজনৈতিক নেতাকে মাটির এত কাছে নেমে এসে সেনাদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাবার পর সেনাবাহিনীর কর্তারা পরিকল্পনায় বসলেন। সেই পরিকল্পনা যে কোনও ক্রাইম থ্রিলারকে হার মানায়। আরব সাগরে কয়েকটি ভারতীয় সাবমেরিনকে ইতস্তত টহল দিতে দেখে পাকিস্তান সম্ভবত ভেবেছিল ভারত তাদের নৌ-ঘাঁটি আক্রমণ করবে। ভারত সেই রাস্তায় হাঁটেনি। প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছিল বিমান আক্রমণ হবে। একজন বায়ুসেনার গায়েও কোনও আঁচড় লাগবে না, এই ব্যাপারে স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীও এই পরিকল্পনায় সায় দেন। আই এস আই গুপ্তচরদের ধন্দে রাখার জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোনও বিমানঘাঁটি থেকে বিমান নেওয়া হয়নি। নেওয়া হলো গোয়ালিয়র আগ্রার মতো বিমান ঘাঁটি থেকে। সীমান্ত থেকে অনেক দূরে হওয়ায় গুপ্তচরেরা কিছুই জানতে পারেনি। এর পরের ঘটনা একই সঙ্গে অভিনব এবং চমকপ্রদ। ভারতের কাছে মিগ, মিরাজ, সুখোই এবং জাগুয়ার পর্যায়ের বিমান আছে। কিন্তু এই অভিযানের জন্য মিরাজ ২০০০ ছিল অটোমেটিক চয়েস। কারণ মিরাজ এমন এক উচ্চতায় উড়তে পারে যার হদিশ শক্তিশালী রাডারও পায় না। ফলে ২১ মিনিট ধরে ভারতীয় সেনা বোমাবর্ষণ করলেও পাকিস্তানের সেনাকর্তারা কিছুই টের পাননি।

নিঃসন্দেহে সার্জিকাল স্ট্রাইক-২ ভারতের সামরিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এই প্রথম ভারত আক্রান্ত না হয়ে পাকিস্তানে ঢুকে বোমাবর্ষণ করল। এর আগে ১৯৭১ সালে ভারতীয় বায়ুসেনা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকেছিল ঠিকই কিন্তু ভারতের নয়টি বিমানঘাঁটি আক্রান্ত হবার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কার্গিল যুদ্ধের সময়েও ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে প্রবেশ করেনি। বস্তুত সার্জিকাল স্ট্রাইক-২ আয়তন এবং ধ্বংস করার ক্ষমতার বিচারে তার পূর্বসূরিকেও ছাপিয়ে গেছে। প্রথম সার্জিকাল স্ট্রাইক হয়েছিল স্থলে। সেবার জইশের বেশ কিছু লঞ্চিং প্যাড ধ্বংস হলেও ৫০ জনের বেশি জঙ্গির মৃত্যু হয়নি। এবার ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে ঢুকে ১২টি মিরাজ ২০০০ থেকে একনাগাড়ে বোমাবর্ষণ করেছে। সব মিলিয়ে বোমার পরিমাণ ১০০০ কেজি। এই পরিমাণ বোমা কোথাও ফেলা হলে ক্ষয়ক্ষতির বহর কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আরও একটি কারণে সার্জিকাল স্ট্রাইক-২-কে এগিয়ে রাখতে হবে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর প্রধান মুজাহিদ আনোয়ার খান কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বাহিনীর নজর এড়িয়ে একটা মাছিও পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারবে না। যে কোনও শত্রুদেশের মোকাবিলা করার ক্ষমতা পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর আছে। সার্জিকাল স্ট্রাইক-২ প্রমাণ করে দিয়েছে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর নজর এড়িয়ে বা কার্যত তাদের বোকা বানিয়ে সেদেশে প্রবেশ করা সম্ভব। এবং যুদ্ধ করা মনস্থ করলে ভারতের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াবার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। কারণ জঙ্গিবাদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ। কম খরচে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আদর্শ মাধ্যম জঙ্গিবাদ। সেই হিসেবে জঙ্গিদের নিরাপত্তা দেবার প্রাথমিক দায়িত্ব পাকিস্তানেরই। সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি এমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তা হলে মিথ্যে হামবড়াই না করাই ভালো। সারা বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের সামরিক ঢক্কানিনাদের অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছে সার্জিকাল স্ট্রাইক-২।

কিন্তু এরপরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সর্বাঙ্গীণ সফল সার্জিকাল স্ট্রাইকের পর কি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে? কিংবা, আমরা কি বলতে পারব, ভারত সন্ত্রাসমুক্ত? না, পারব না। কারণ ভারতের বাইরে পাকিস্তান মাত্র একটি, ভেতরে অসংখ্য। এদেশের মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ স্বভাবদোষে পাকিস্তান-পন্থী হবেন এটা ধরেই নেওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরা কেন পাকিস্তানপন্থী হয়ে ওঠেন? ভারতীয় মিডিয়া কেন পাকিস্তানের সুরে কথা বলে? এদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভারত কোনওদিন সন্ত্রাসমুক্ত হবে না। কাশ্মীর সমস্যারও সমাধান হবে না।

ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট অভিনন্দন বর্তমান পাকসেনার হাতে ধরা পড়ার পর ভারতের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এবং মিডিয়ার দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলেই জানেন, সার্জিকাল স্ট্রাইকের পরের দিন ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানকে গুলি করে নামিয়েছিল পাক সেনা। তখন ধরা পড়েন উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পরে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান তাকে ফিরিয়ে দেয়। অথচ মিডিয়া, বিশেষ করে বাংলা মিডিয়ার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আনন্দবাজার পত্রিকা যা লিখেছে তার মর্মার্থ এই রকম : অভিনন্দন ধরা পড়েছেন তার জন্য দায়ী মোদী। আর তিনি মুক্তি পেলেন ইমরান খানের সৌজন্যে। পাকিস্তানের প্রতি এমন নির্বিচার আনুগত্য বোধহয় সে দেশের মিডিয়ারও নেই।

ভারতের বিমানহানার সত্যতা নিয়েও আনন্দবাজার সন্দিহান। পাশাপাশি বলতে হয় 'এই সময়' পত্রিকার কথাও। কাশ্মীরের কয়েকজন সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটিতে। তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধ চান না, শান্তি চান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভারত যুদ্ধ করল কোথায়? আত্মরক্ষা করা আর যুদ্ধ করা তো এক নয়।

বস্তুত পাকিস্তানপন্থী মিডিয়ার চালিকাশক্তি হলো আমাদের দেশের পাকিস্তানপন্থী রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি কপিল সিবাল। বিশিষ্ট আইনজীবী এবং কংগ্রেস নেতা। নরেন্দ্র মোদী ওয়ার মিউজিয়াম উদ্বোধন করার পর তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছে তাদের জন্য ওয়ার মিউজিয়াম করা হলো, এ খুব ভালো কথা। কিন্তু এখন যারা শহিদ হচ্ছেন তাদের জন্য নরেন্দ্র মোদী কী ভাবছেন? তাদের জন্যেও তো কিছু ভাবা দরকার।' কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ কিন্তু আড়ালে একটি নিগূঢ় অর্থ রয়েছে। সিবালসাহেবের ইঙ্গিত কাশ্মীরে জারি করা অপারেশন অলআউটের দিকে। জঙ্গি দমন করতে গিয়ে বেশ কিছু জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে, এটা ঘটনা। কিন্তু সিবালসাহেব, বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করে কেউ কি কখনও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে? আপনার 'সেনাদের জন্য কিছু করার' পরামর্শের আড়ালে রয়েছে কাশ্মীরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার প্রস্তাব। ইউপিএ আমলে কাশ্মীরে অবাধে বাড়তে দেওয়া হতো জঙ্গিদের। আপনি সেই ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনতে চান। নরেন্দ্র মোদী এবং এনডিএ সরকার যতদিন কেন্দ্রে আছে ততদিন সেটা সম্ভব নয়।

জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং অভিনন্দন বর্তমানকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্যই নরেন্দ্র মোদীর সাধুবাদ প্রাপ্য। কিন্তু আরও বড়ো কাজ তাঁকে করতে হবে। দেশের ভেতরে যত মিনি পাকিস্তান আছে এবং ইসলামিক দুনিয়ার অর্থে প্রতিপালিত যত মিডিয়া আছে তাদের সবাইকে শেষ করতে না পারলে ভারত কোনওদিন পুরোপুরি সন্ত্রাসমুক্ত হবে না। দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের গর্বের ভারতীয়ত্ব অম্লান রাখার জন্য এই বড়ো কাজটা সবাই মিলে করতে হবে। নয়তো ভারতীয়দের কোনও দেশ থাকবে না।

শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহ



শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে ৩৩ তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। তেলেঙ্গানার সেবা ভারতী এবং আরোগ্য ভারতীর সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ বি সুরেন্দ্র রেড্ডিকে এবছরের সেবা সম্মান প্রদান করা হয়। তাঁকে শাল, শ্রীফল, মানপত্র এবং এক লক্ষ টাকার চেক দিয়ে দিয়ে সম্মানে ভূষিত করেন ওড়িশার রাজ্যপাল প্রফেসর গণেশ লাল। শ্রীলাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিব জ্ঞানে মানব সেবাই হলো প্রকৃত ভক্তি। শ্রীরেড্ডি বহু বছর স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীকে পাথেয় করে মানব সেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গ সেবা ভারতীর সভাপতি তাপস সরকার এবং সম্পাদক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরেড্ডিকে শাল ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী বিমল লাট। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়ার ডিন ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত হয়ে শ্রীরেড্ডি বলেন, আরোগ্য, ভোজন, চিকিৎসা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার ও সাকারাত্মক ভাবনার সমাবেশ ঘটাতে পারলে মানুষের জীবনস্তর উন্নত হয়। শিশুকাল থেকেই প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত তাঁদের সন্তানকে সঠিক সংস্কার প্রদান করা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্রের কণ্ঠে ড. অরুণপ্রকাশ অবস্থী রচিত গান 'যুগ বন্দন স্বীকার করো, অব প্রজ্ঞাকে অনুপম আলোক' সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সাহিত্য সচিব বংশীধর শর্মা। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের একেবারে প্রথমে পুলওয়ামায় শহিদ জওয়ানদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম শিবপুর শাখার দান সংগ্রহ অভিযান

গত ১৫ জানুয়ারি পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের হাওড়া মহানগরের শিবপুর সমিতির উদ্যোগে মন্দিরতলায় মকর সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষ্যে গিরিবাসী-বনবাসী ভাই-বোনেদের জন্য দান সংগ্রহ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। শিবপুর সমিতির সমস্ত মহিলা ও পুরুষ সদস্য অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নতুন পোশাক, বাসনপত্র ও নগদ অর্থ সংগৃহীত হয়। শিবপুরবাসী নানাভাবে এই অভিযানে সবযোগিতা করেন।



ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আশুতোষ মুখর্জি মেমোরিয়াল অডিটোরিয়মে ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন এবং আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে 'ন্যায়াধীশ রমাপ্রসাদ মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়। 'ভারতের বিদেশনীতি ঃ অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক আলেচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন ন্যায়াধীশ চিত্ততোষ



মুখার্জি। শুরুতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সুজিত ধরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. রাধারমণ চক্রবর্তী, জাতীয় অধ্যাপক ড. জয়ন্ত রায়, অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধর প্রমুখ। সভায় বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত ডাঃ ধরের সহধর্মিণী তথা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্য শ্রীমতী মহুয়া ধর। সভা পরিচালনা প্রদীপ চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. দেবদত্তা চক্রবর্তী।

বারুইপুরে ভারতমাতা পূজা, বিশ্বশান্তি যজ্ঞ ও রক্তদান শিবির

গত ২৯ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সেবা ভারতীর উদ্যোগে বারুইপুর রাসমাঠে অনুষ্ঠিত হয় ভারতমাতা পূজা, বিশ্বশান্তি যজ্ঞ ও রক্তদান শিবির। ৪ জন মহিলা-সহ ৪২ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের কার্যকরী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস, সমিতির সদস্য কমল চ্যাটার্জি ও শঙ্করলাল সরকার, জেলা সম্পাদক অজিত বসু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, নগর সঙ্ঘচালক ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার। অনুষ্ঠানে ৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

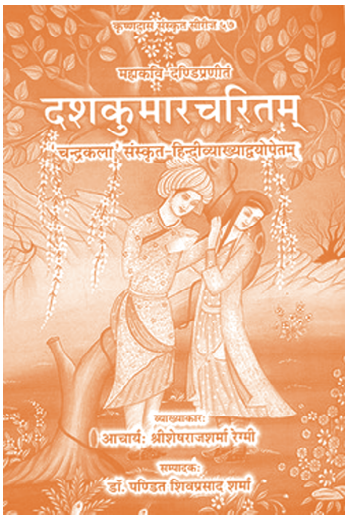


অযোধ্যা পাহাড়ে কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির

গত ১ফেব্রুয়ারি বনবাসী কল্যাণ আশ্রম শিবপুর শাখার উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে দু'দিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন ১৭৫ জন এবং দ্বিতীয় দিন ২৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিষেবা প্রদান করা হয়। একাজে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান ও একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা করেন।

মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের অভিনন্দন সভা

গত ২ জানুয়ারি কলকাতায় মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে সিএ ইনস্টিটিউটের রিজিওনাল কাউন্সিলে রি-ইলেকটেড সিএ সুমিত বিনানীকে সম্মানিত করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সভাপতি ডিকে মোহতা। অনুষ্ঠানে সুমিতজী যুব সমাজকে উৎসাহিত করে বলেন, সাংবিধানিক পদের জন্য যুবা প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। উৎকৃষ্ট যোগ্যতায় পদগুলির শোভাবর্ধন করতে হবে। প্রধান বক্তা সিএ শরদ মেহতা বলেন, আমাদের যুবপ্রজন্মকে আইএএস, আইপিএস ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হবে এবং উচ্চপদে আসীন হয়ে দেশের সেবা করতে হবে। সিএ মমতা বিনানী উপস্থিত যুবা বর্গকে আশীর্বচন প্রদান করেন। সঞ্চালন করেন কেন্দ্রের সচিব অরুণ কুমার সোনী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের কোষ সচিব আদিত্য বিনানী। সহযোগিতা করেন পবন বিহানী, অঙ্কিত রাঠী, যোগেশ কোঠারী, শ্রীমতী মেঘা রাঠী, পদ্মা বাগড়ী, পঞ্চানন ভট্টর প্রমুখ।



সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য দশকুমার চরিত

অমিত ঘোষ দস্তিদার

সংস্কৃত সাহিত্যের ধারায় কোনো কবি বা লেখক নিজেদের জীবন, জীবনকাল বা কৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ করে যাননি। ফলে তাঁদের বিষয়ে কিছু লিখতে বা বলতে গেলে কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেরকমই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত গদ্যকাব্য 'দশকুমার চরিত'-এর রচয়িতা দণ্ডী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

'অবন্তীসুন্দরীকথা' ও 'অবন্তীসুন্দরীকথাসার' থেকে জানা যায় যে, কৌশিক গোত্রের নারায়ণস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের দামোদর নামে এক পুত্র ছিল। দামোদরকে অনেকে কিরাতার্জুনীয় কাব্যের প্রণেতা ভারবি বলে মনে করেন। দামোদরের পুত্র ছিলেন মনোরথ। মনোরথের পুত্র বীরদত্ত। এই বীরদত্তই হলেন দণ্ডীর পিতা। মাতার নাম গৌরী। সবদিক বিচার বিবেচনা করে ধর্মেন্দ্র কুমার গুপ্ত তাঁর 'এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অব দন্ডী অ্যান্ড হিস ওয়ার্ক' গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় ৬৬৫ থেকে ৭১০ অথবা ৭২০ খ্রিস্টাব্দকে দণ্ডীর সময়কার বলে নিরূপণ করেছেন। বাল্যকালে দণ্ডী মাতৃহীন এবং উপনয়নের পর পিতৃহীন হন। অবন্তীসুন্দরীকথাসারে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী ও শ্রুত নামে দুজন তাঁকে পালন করেন। কাব্য ও অলংকারশাস্ত্র ছাড়াও অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি জ্ঞানী ছিলেন।

দণ্ডী কথার অর্থ দণ্ডধারী পুরুষ। দণ্ডী সম্ভবত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের আচার আচরণ, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে দণ্ডী অন্যতম অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী ছিলেন। দণ্ডীর সঙ্গে একাসনে সুবন্ধু ও বাণভট্টকে বিশেষজ্ঞরা মান্যতা দেন।

দণ্ডী রচিত মূল 'দশকুমার চরিত' গ্রন্থটি কখনো অক্ষত আকারে পাওয়া যায়নি। শেষের কিছু অংশ বিলুপ্ত। 'দশকুমার চরিত' নামকরণ থেকে বুঝতে পারা যায় গ্রন্থটি দশজন কুমারের বৃত্তান্ত সংবলিত। প্রথম কুমার হলেন মগধের রাজা রাজহংস এবং রানি বসুমতীর সন্তান রাজবাহন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুমার হলেন রাজহংসের মিত্র প্রহার বর্মার দুই পুত্র যথাক্রমে অপহার বর্মা ও উপহার বর্মা। মগধের মন্ত্রী ধর্মপালের তিনপৌত্র মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও অর্থপাল হলেন যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কুমার। মগধের অন্য মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের দুই পৌত্র যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম কুমার। মগধের আরও এক মন্ত্রী সিতবর্মার দুই পৌত্র প্রমতি ও সোমদেব যথাক্রমে নবম ও দশম কুমার।

দশকুমার চরিত বর্তমানে তিনটি অংশে পাওয়া যায়। প্রথম পূর্বপাঠিকা বা পূর্ববৃত্তান্ত, দ্বিতীয় মূল দশকুমার চরিতের গল্পাংশ এবং তৃতীয় উত্তরপীঠিকা বা শেষ অংশ। এই গদ্যকাব্যটি আখ্যায়িকা শ্রেণীর রচনা। মূল গ্রন্থ পূর্ব পীঠিকায় ছিল পাঁচটি উচ্ছ্বাস এবং উত্তর পীঠিকায় ছিল দশটি উচ্ছ্বাস। মূল গ্রন্থের এই দুটি অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একাধিক রচনাকার বিভিন্ন সময়ে তাঁদের রচনা সংযোজন করেন। ফলে বর্তমান 'দশকুমার চরিত'-এর সংযোজন অংশে ভাষা ও ভাবের অসংলগ্নতা খুবই প্রকট। গ্রন্থটিকে রক্ষা কররে জন্য এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। ভট্টনারায়ণ, বিনায়ক, চক্রপাণি দীক্ষিত, পদ্মনাভ, গোপীনাথ কবিরাজ প্রমুখ গ্রন্থটির বিলুপ্ত অংশগুলিতে সংযোজন করে এক মহা কাজ সম্পাদন করে গেছেন। কারণ তাঁরা এই মহা গ্রন্থটিকে কালের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেননি।

মগধের রাজা রাজহংস মালবরাজ মালসারের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পত্নী বসুমতী সহ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রের নাম রাজবাহন। ঘটনাক্রমে আরও ন'জন মন্ত্রীপুত্র সেখানে এসে উপস্থিত হন। কুমারেরা বড়ো হয়ে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে ঋষি বামদেবের পরামর্শে রাজা তাদের দিগ্‌বিজয়ের অনুমতি দেন। কুমারেরা প্রথমে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত বন। সেখানে ব্রাহ্মণবেশী কিরাত মাতঙ্গের সঙ্গে রাজবাহনের দেখা হয়। পাতালকন্যা কালিন্দীর সঙ্গে মাতঙ্গের বিয়েতে সাহায্য করার জন্য সকলের অলক্ষ্যে রাজবাহন প্রস্থান করেন। অন্য কুমাররা রাজকুমারের খোঁজে বেরিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে আবার তাঁরা মিলিত হয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। দশকুমার চরিতের মূল ভাব এটিই।

দশকুমার চরিত গ্রন্থটি বহু বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সেসময় সমাজের ভালো-মন্দ দিকগুলির বাস্তবোচিত চিত্র দণ্ডী গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন এবং বাস্তবচিত্র অঙ্কনে দণ্ডী একজন কুশলী কথাশিল্পী হিসেবে সংস্কৃত গদ্যকাব্যে আজও অমর হয়ে আছেন। দণ্ডীর সরল, সাবলীল এবং ললিত বর্ণনার জন্য প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছিল --- 'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্।' কথিত, স্বয়ং দেবী সরস্বতী দণ্ডী সম্পর্কে বলেছেন— 'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ।' ▮



সার্ধশতবর্ষে মহেশচন্দ্র ঘোষ

দেবপ্রসাদ মজুমদার

বাঙ্গালি তার অতীতকে কখনোই মনে রাখেনি। তার ফলে তার পরিচিতি সত্তার বিপর্যয় ঘটছে। আমরা বিস্মৃত হয়েছি সেই সকল মহাপ্রাণকে যাঁরা তাঁদের জীবন, কর্ম, চিন্তা, দর্শন দ্বারা এই বাঙ্গালিকে উদ্বুদ্ধ করে জগৎসভায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করেছেন। এমন এক বিস্মৃত মহাপ্রাণ হলেন মহেশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)। তাঁর পিতা ছিলেন রামজয় ঘোষ।

বর্তমান বাংলাদেশের পাবনায় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্রের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁর বড়ো ভাই রাধাচরণ ঘোষ ছিলেন ডাক্তার। তাঁর তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত পালিত হন ও লেখাপড়া করতে শুরু করেন। তিনি তখনও বি.এ. পাশ করেননি, এমন সময় ঘটল তাঁর দাদার অকাল প্রয়াণ। সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর উপর।

মহেশচন্দ্র ছিলেন এক আত্মমগ্ন দার্শনিক। জ্ঞান আহরণ ছিল তাঁর জীবনের তপস্যা আর বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাদানই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অসহায় অবস্থায় সংসার প্রতিপালনের জন্য তিনি শিক্ষকতাকেই জীবিকারূপে নির্বাচন করলেন। তিনি প্রথমে রামপুরহাটে, পরে বাঁকুড়া ও তারপর হাজারিবাগে শিক্ষকতা করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ কালই হাজারিবাগে কাটে। হাজারিবাগ সরকারি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শেষ করেন। বহুবছর ধরে মহেশচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ওই সময় প্রবাসীর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মহেশচন্দ্র ও রামানন্দ ছিলেন সমবয়সি এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। রামানন্দ লিখেছেন— ''মহেশচন্দ্র ছিলেন মানব প্রেমিক ও সাধক।



সত্যের সন্ধানে তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার লাইব্রেরি ছিল তাহারই পরিচয়।''

ব্যক্তিগত ভাবে মহেশচন্দ্র ছিলেন সহজ সরল উচ্চ চিন্তার মানুষ। তিনি ছিলেন অকৃতদার, মিতব্যয়ী ও স্বল্পাহারী। তাঁর শখ ছিল বই কেনা ও বই পড়া। তাঁর আয়ের বেশিরভাগ অংশই বই কিনতে খরচ হয়ে যেত। বস্তুত তিনি ছিলেন গ্রন্থ প্রেমিক। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অর্ডার দেওয়া বই ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এসেছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসমূহ সাধারণ ব্রহ্মসমাজ লাইব্রেরিকে দান করে যান এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হাজারিবাগ ইউনিয়ন ক্লাবকে দান করেন।

তাঁর উপনিষদের জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সাহচর্যে 'বৃহদারণ্যক, ও ছান্দোগ্য' উপনিষদের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তিনি ছিলেন এক অসামান্য পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ওই সকল প্রবন্ধের একটিও আর পাওয়া যায় না। কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব ভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ' নামক একখানি পুস্তক ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থের কথা জানা যায় না। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মাত্র ৬২ বছর বয়সে এই মহামানবের অকাল প্রয়াণ ঘটে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, বেদ, নিরাকার সাধনা, খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি নানান মূল্যবান প্রবন্ধাদি লিখলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অগ্রজ রাধাচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন এবং ওই জীবিকা গ্রহণ করবার একমাত্র কারণ ছিল দরিদ্রদের সেবা করা। তিনি দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করতেন। প্রাচ্যধর্ম তথা দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বেদান্তরত্ন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ■



দোলে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দোল পূর্ণিমায় কল্যাণী ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব ও মেলা— ঘোষপাড়ার মেলা বা সতীমার মেলা বাংলার বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। মেলায় মশায়গণ (গুরু) নিজ নিজ আসনে বসেন এবং ভক্তগণ সেখানে দোল করেন। আম ও লিচু গাছতলায় নিজ নিজ আখড়ায় ভক্তগণের তিনদিন ব্যাপী ভাবের গীত পরিবেশন, হিমসাগরে স্নান, ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে মানত করা ইত্যাদি চলে। আগে এই মেলা সাতদিন চলত, এখন তিনদিন চলে। এই মেলায়— হিন্দু, মুসলমান, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম। মেলায় একসাথে বসে খাওয়া প্রধান কর্তব্য বলে ধরা হয়। মেলা সম্বন্ধে নদীয়ার মহকুমা শাসক কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, ঘোষপাড়ার মেলায় সকল জাতির সমাগম। ঘোষপাড়া কর্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র। বাগানের মধ্যে রাস্তার দু'ধারে মেলা বসে। নাগরদোলা, সার্কাস, হোটেল, বড়ো বড়ো মিষ্টির দোকান প্রভৃতির বেচাকেনা বেশ রমরমিয়ে চলে। খইয়ের তৈরি 'খইচুর' এখানকার এক বিশেষ মিষ্টি। সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মেলার জায়গায় প্রাচীর তুলে দেওয়ায় মেলার স্থান অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে। তবুও মেলার জাঁকজমক বিন্দুমাত্র কমেনি। বহু কীর্তনের দল দোলের দিন ডালিমতলায় ও মায়ের মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করেন। মেলায় রঙ খেলা হয় না, আবির বা ফাগ খেলা হয়। মেলার আগের দিন চাঁচর। মেলা প্রাঙ্গণ সারারাত ভাবের গীত ও বাউল গানে মুখরিত থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বাউলগণ এই মেলায় যোগদান করে এবং বাউলগানে মাতিয়ে তোলে। ভোরে দেবদোল ও মায়ের পূজা হয়।

সতীমা ছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মা— সতীমা। সেই ধারা আজও অব্যাহত। হিন্দু-মুসলমান সকলেই আসেন, সকলেই সমান, কোনও বিভেদ নেই।

ডালিমতলা

ঘোষপাড়ায় সতীমার মন্দিরের বাইরে একটি ডালিম গাছ আছে। গাছটির কোন্‌টা মূল শিকড় তা জানা যায় না। অনেকগুলি গুড়ি আছে। কোন্‌টা যে আদি বোঝা যায় না। সতীমার মেলায় পুণ্যার্থীগণ হিমসাগরে স্নান করে ডালিমতলায় মানত করেন। ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে ভক্তরা মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য নিবেদন করেন তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন—

লালন কয় তোর মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি খানা আর ডোবাতে।

ডালিমতলার মাটিতে রোগ নিরাময় হয়। শোনা যায়, এই ডালিমতলার মাটি নিয়ে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ এক কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। এই ডালিমতলায় সতীমা সিদ্ধিলাভ করেন। ডালিমতলায় মানত করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়, বন্ধ্যার পুত্র লাভ, রোগ মুক্তি, চাকুরি লাভ হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন এবং ডালিম গাছে মানত করেন। রোগ মুক্তির জন্য বহু ভক্ত ডালিমতলার মাটি বাড়ি নিয়ে যান। প্রশাসন থেকে ডালিম গাছের চারধার লোহার গ্রিল দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিমসাগর

সতীমার মন্দিরের আর একটি পুণ্যস্থান হিমসাগর। এটি একটি বড়ো পুকুর বা সায়রের মতো। হিমসাগরে স্নান করে বহু ভক্ত ব্যাধি মুক্ত হন এবং তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় হিমসাগরের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভক্ত হিমসাগরের জল বাড়ি নিয়ে যান— রোগমুক্তির জন্য এই জল ব্যবহার করেন। হিমসাগর থেকে স্নান করে সিক্ত বসনে মন্দির পর্যন্ত দণ্ডি কাটেন। হিমসাগরে স্নান করলে বোবার বোল ফোটে এবং অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বিষয়গুলি এখনও লোক মুখে ফেরে। মেলার সময় হিমসাগরে জল কম থাকে। এই জলে স্নান করে অসংখ্য মানুষ পুজো দেন।

একটি প্রবাদ আছে—

এক মনে এক প্রাণে আসিলে হেথায়
দুরারোগ্য রোগ হয় আরোগ্য ত্বরায়।

সাধারণ মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট। আপদ বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিপদমুক্ত করেছিলেন সতীমা। তাই আজও অগণিত মানুষ আসেন সতীমার কাছে বিপদমুক্ত হতে। তাই সতীমা আপামর মানুষের আপনজন।

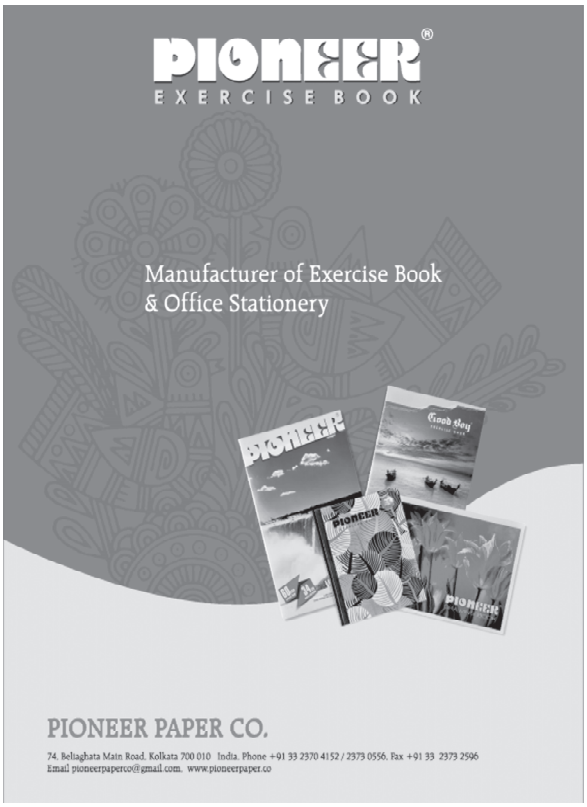
সতীমার জয়ধ্বনিতে দোলের দিন মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঘোষপাড়ার সতী মায়ের মেলা।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

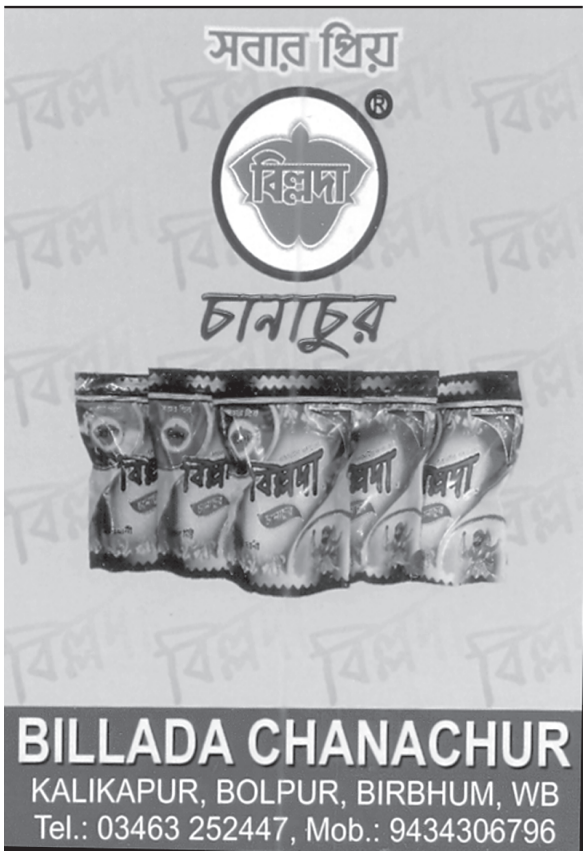
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



এত্তা জঞ্জাল

পার্থসারথি গুহ

একদিন সকালে উঠে গোটা দুনিয়া আবিষ্কার করল সৌন্দর্যায়নের একেকটা অংশ হিসেবে গড়ে ওঠা পার্ক, মল, সিনেমা হল, থিয়েটার, বাজারহাট সব কেমন যেন পালটে গিয়েছে। অন্যান্য সব কিছু অবিকৃত থাকলেও এইসব জায়গায় বাহারি ডাস্টবিনের জায়গা হিসেবে যেসব প্রাণীর প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো বেমালুম পালটে গিয়েছে। আরও অদ্ভুত যেটা তা হলো, কুমির, শিম্পাঞ্জি, বাঁদর, ডলফিন, ভাল্লুকদের জায়গায় সব কটা ডাস্টবিনে রাতারাতি খোদাই করা হয়েছে নানা ঢংয়ের মানুষের মূর্তি। ডাস্টবিনের অবয়বে সুবেশা নারী, পুরুষ তথা পরিচিত সেলিব্রিটিরা যেন বলছেন, ইউজ মি। হায়, এমন দিনও দেখার ছিল!



কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই বলে নয় এই একই ছবি বিশ্বের সর্বত্র। লন্ডন, ওয়াশিংটন, মিউনিখ, প্যারিস, রোম, মেলবোর্ন, ওয়েলিংটন, জোহানেসবার্গ, বেজিং, টোকিও সব বড়ো শহর আর শহরতলি জুড়ে জঞ্জাল ফেলার ডাস্টবিনে এক রাতের মধ্যেই গজিয়ে উঠেছে নানা বেশের বাহারি মানুষের মূর্তি। দুনিয়ার সব থেকে অস্বচ্ছ, কুটিল মননশীলতার অধিকারীদের এ যেন এক চরম পুরস্কার। মানবজাতির মধ্যে এই ঘটনা তোলপাড় ফেলে দিলেও এর বীজ কিন্তু বোনা হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই।

কোনও গভীর জঙ্গল বা গোপন জায়গায় ওরা সমবেত হয়নি। ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে অস্থায়ী পুলিশ কিয়স্কের একদম উলটোদিকে। তার আগে অবশ্য পুলিশ মামারা জায়গাটা ছেড়ে কোথায় যেন সেঁধিয়ে গিয়েছে। তখন ঘড়ির কাটা জানান দিচ্ছে রাত ২টো।

এমন একটা জায়গা ওরা বেছেছে যেখানে চট করে কোনও বাইরের পাবলিক এসে ভিড় জমায় না। এমনকী ভ্যাগাবনড বা ভবঘুরে জাতীয়রাও সহজে এই আস্তানায় আসে না। তার ওপর আশে পাশে বাড়িও সেরকম নেই। রাস্তার অপর প্রান্তে যেহেতু জমজমাট বাইপাস তাই ওদিকটার খেয়াল রাখার জন্যই এই পুলিশ ক্যাম্পটা তৈরি হয়েছে। তাই এখানে সেভাবে দেখা মেলে না কারোরই। আসলে নামেই পুলিশের ক্যাম্প। অন্যান্য ক্যাম্পে যে ব্যস্ততা চোখে পড়ে তার ছিঁটেফোঁটাও দেখা যায় না এখানে। এরকম জনবিরল জায়গা তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী সংগঠন বা অতি বাম সংগঠনের গুপ্ত মিটিং করার আদর্শ



জায়গা বটে। অবশ্য যারা এই বৈঠকের মধ্যমণি তারা কোনও রাষ্ট্র বা দেশ বিরোধিতায় শামিল হননি। তাদের মূল প্রতিবাদ দুনিয়ার দখলদার মানবজাতির বিরুদ্ধে। সেজন্যই এরা এখানে হাজির হয়েছে জল-জমি-নগর-গ্রাম মায় জঙ্গলের মাতব্বর বলে নিজেদের জাহির করা মানবজাতির বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি করতে।

এদের অনেকের আদি বাড়ি বলতে গেলে জঙ্গলের কথাই বলতে হবে। আবার কেউ কেউ উভচরেও বিচরণ করে থাকে। যেমন এই সভার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য কুমির জেঠু। তিনিও এই সভা আলোকিত করছেন। অ্যান্টার্টিকা থেকে আসা কচি বয়সের একটি ডলফিনকেও দেখা যাচ্ছে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বক্তব্য রাখতে। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্যাঙারু বাবাজীবনও এসেছেন। তাছাড়া দূরের জঙ্গল থেকে বাঁদর, ভল্লুক, শিম্পাঞ্জিদেরও দেখা যাচ্ছে এই বিশেষ মিটিংয়ে হাজির হতে। তা প্রশ্ন উঠতেই পারে জঙ্গলের নিরাপদ আস্তানা ছেড়ে কেনই বা শহরের বুকে এই সভা। সেক্ষেত্রে একটা কথাই জানা গিয়েছে যে শহরকে নিজেদের আড়ত বানিয়ে রেখেছে যে মনুষ্য সমাজ তাদের কর্মকাণ্ডই টার্গেট এই সভার। রং-বেরঙের শহুরে সভ্যতার সৌন্দর্যায়নের শরিক করে তুলতে অবোলা প্রাণীদের যেভাবে চলমান ডাস্টবিন বানানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য এই সভার।

মানুষের কিতাবে তো পড়ানো হয় যে কাক হলো জমাদার শ্রেণীর প্রাণী। তা সেই কাউয়া খুড়োর সঙ্গে ওদের কোনও বিবাদ নেই। আর মানুষ এই কাউয়া জাতিকে জমাদার বলে হয়তো কাকেদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে। ওরাই তো মানুষের সব রাশি রাশি জঞ্জাল মুখে করে এদিক-ওদিক ফেলে শহরটাকে পরিষ্কার রাখে। সে পর্যন্ত না হয় মানা গেল। কিন্তু হালফিল (তাও বেশ কয়েক বছর হলো) মানুষ যে জিনিসটা শুরু করেছে তা কিছুতেই ভালো মনে মেনে নিতে পারছে না ওরা, মানে এই মিটিংয়ের মূল উদ্যোক্তারা। আরে বাবা কাউয়া খুড়ো না হয় তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য তোমাদের পড়ার বইতে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু, তা বলে ঝাঁ-চকচকে মল, রেস্তোরাঁ, বাজার, পার্ক ইত্যাদিতে কোন আক্কেলে ডাস্টবিনের মতো খাড়া করে রাখা হয়েছে ডলফিন, বাদর, শিম্পাঞ্জি, কুমির ইত্যাদি প্রাণীকে।

যেন সবজান্তা মানুষ বার্তা দিচ্ছে, দেখ দেখ, এই হচ্ছে গিয়ে তোমাদের যাবতীয় নোংরা ফেলার জায়গা। যত খুশি জঞ্জাল এখানে ফেল। সে তোমাদের বাড়ির ডাই করা আবর্জনাই হোক বা মল বা পার্কে বেড়াতে গিয়ে চেনা খাবারের প্যাকেট। এমনকী রাতে ছাইপাঁশ গিলে সেই বিচ্ছিরি গন্ধওয়ালা বোতলগুলোও ওই অসভ্য লোকগুলো মাঝেমধ্যে ফেলে দিয়ে যায় এই প্রাণীদের আকারে সজ্জিত ডাস্টবিনে। এ ব্যাপারেই একটা হেস্তনেস্ত করতে এই সভা ডাকা হয়েছে রাতের অন্ধকারে। যে মানুষ জাতি সারা বিশ্বটাকে এমন নরক গুলজার বানিয়ে তুলেছে, যাদের মাত্রাতিরিক্ত জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ফলে দুনিয়াটা এখন বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে, তাপমাত্রার রকমফেরে ভয়াবহ সব মহামারি এসে বাসা বাঁধছে, তাঁরাই তো সব চেয়ে বেশি জঞ্জাল-আবর্জনার ধারকবাহক। ওপরে এটা ওটা মেখে যতই প্রলেপ দিক না কেন, ভিতরের শয়তানটা তো ওদের আচার আচরণের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। কুমির জেঠু নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলে উঠলেন, আরে ওরা অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসে দেশের পতাকা নিয়ে এমনভাবে মার্চপাস্ট করে যেন দেশপ্রেম উথলে উঠছে। আগে নিজের চারপাশটা ঠিক কর। তাহলে বুঝব তোরা ভগবানের তৈরি শ্রেষ্ঠ জীব। কুমির জেঠুর মুখ থেকে কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে শিম্পাঞ্জি মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, আরে রাখ কুমিরদা, শিষ্টাচার কিনা মানুষের কাছে শিখতে হবে। যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। তাও ক্ষণিক লাভ ওঠাতে অন্য জীবজন্তু বা গাছগাছালিদের কোনও দয়ামায়া দেখায় না তাদের কাছে কীই বা আশা করা যায়। তাছাড়া ওরা যাদের হেয় করে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, সেই জোকারদেরও এমন ডাস্টবিন সাজিয়ে রেখেছে। ফিচেল ডলফিনের বয়স কম, মিটিং শোনার থেকে এদিক ওদিক ঝাঁপাঝাঁপিতে বেশি মন। সেজন্য একটু আগেই সভার বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে কড়া ধমক শুনতে হয়েছে। সেই ডলফিন হঠাৎ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলে উঠল, আরে মানুষের বন্ধু বলে তোমরা আমায় বদনাম দাও। কিন্তু বিশ্বাস করো, যেদিন থেকে ওই ডাস্টবিনে আমাদের মূর্তি খোদাই করেছে বেয়াক্কেলে মানুষ সেদিন থেকে ওদের প্রতি যাবতীয় ভক্তি শ্রদ্ধা উবে গিয়েছে। ওরা শুধু জীবজন্তু বা উদ্ভিদ নয়, নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের কথাই ভাবে না, এতটাই স্বার্থপর। বাঁদর সব শুনে মাথাটা দিগ্‌গজের মতো নাড়াতে নাড়াতে বলল, শুধু কি তাই, এখন তো শুনছি, ওদের মধ্যে যারা ধনবান ও ক্ষমতাশালী তারা মঙ্গল গ্রহ আর চাঁদমামার আস্তানায় পর্যন্ত ডেরা বাঁধার চেষ্টা চালাচ্ছে। ভাবো কী মনোবৃত্তি। দশভাগ লোক সুযোগ সুবিধা আছে বলে ফুর্তি করবে, বাকিরা পচে গলে মরবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠা পৃথিবীতে। আমরা বাবা যতই পশু হই না কেন, দল বেঁধে থাকি, যাবতীয় শখ-আহ্লাদ, দুঃখ-কষ্ট একসঙ্গে ভাগ করে নিই। ওরা পারবে? ভাগ্যিস, মানুষ হয়ে জন্মাইনি। বস্তুত, এই মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, পদে পদে যে মানুষ অন্য জীবকে ছোটো করে দেখায়, তাদের চরম শিক্ষা দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে, হে মানব, কুমির, ভাল্লুক, শিম্পাঞ্জি, বাঁদররা নয়, এত্তা জঞ্জাল তোমারাই। ▮

গল্প



ঝড়ের পর

প্রদীপ মারিক

বেশ ছিল শীতটা, হঠাৎ কেমন যেন হাওয়া হয়ে গেল। আবার একটা বছরের একটু কম সময়ের অপেক্ষা। সুবল কিন্তু শীত বিদায় নিতে খুব খুশি হয়েছে। এই সোয়েটার মাফলার জড়িয়ে মাঝ দরিয়ায় ভেসে মাছ ধরতে জাল বেছাতে তার বেশ অসুবিধাই হতো। শীত চলে গেছে এতে সে খুশিই।

সামনের হপ্তায় অমাবস্যা। হুঁকায় টান দিতে দিতে ক্যালেন্ডারে চোখ রাখলো সুবল। আর তো দেরি করা ঠিক হবে না। জবেন মাঝির কাছে এক্ষুনি গিয়ে জাল ঠিক করতে হবে। এই কোটালেই ট্রলার ভর্তি করে মাছ তুলতে হবে। সুবল জবেন মিঞার বাসায় গিয়ে বলল, 'জবেন ভাই বাড়িতে আইস, জাল খান বার কর দেহি'। জবেন মিঞা বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে বলল, 'কে রে এ কথা কইছিস! জাল বাহির করুম, এই তো গত হপ্তায় মাঝ দরিয়ায় ভেসে দেইখলাম একখান বড়ো মাছ জালে পড়লুনি, লাভ তো দূরের কথা, এক বান্ডিল বিড়ির পয়সা কি উঠেসে?' সুবল খানিক চুপ করে থাকার পর বলল, 'তা যা বলেছো! কথা খান ঠিক কিন্তু আইগকে সময়টা একটু আলাদা, তুমি যদি না যেতি পারো জালটা আমারে দাও যা ভাড়া হয় আমি দিয়ে দেবো।'। জবেন মিঞা ভাবলো সুবল তার থেকে ছোটো হতে পারে ঠিকই কিন্তু এই মাতলা নদীটা তার থেকে ভালোই চেনে, সুবলের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে কোনোদিন তার লাভ বই ক্ষতি হয়নি। গত হপ্তায় খোকনের সঙ্গে গিয়েই তো তার বিড়ির পয়সা উঠলো না। জবেন মিঞা তাই সুবলের কথায় আর না করল না। রাজি হয়ে গেল। পাঁজিটায় একবার চোখ বোলালো, অমাবস্যা লাগছে রবিবার। সুতরাং শনিবার যদি ট্রলার ভাসানো যায়, ভাগ্য ভালো থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রলারে মাছ ভর্তি হবে। এক বুক আশা নিয়ে জবেন মিঞা চললো মাঝ দরিয়ায়।

ক্যানিংয়ের মাতলা নদীঘাট থেকে একটার পর একটা ট্রলার ছাড়ছে, সুবল কিন্তু ট্রলার ভাসাচ্ছে না। শুধু হিসাব করে এক হপ্তার চাল, ডাল, কেরোসিন আর অবশ্যই খাওয়ার জল আর বিড়ি মজুত করছে। জবেন মিঞা, সুবলকে বলতে চাইছে কখন সে ট্রলার ভাসাবে, কিন্তু এ কথা বলার সাহস তার নেই। কারণ সুবলের চোখ দিনের বেলার থেকে রাতের বেলায় বেশি জ্বলে। ঠিক কোন জায়গায় মাছের ঝাঁক আসবে সেটা সে ভালো মতোই জানে। জবেন মিঞা একথা ভাবতে ভাবতেই ট্রলারের ডেকে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ সুবল বলল, 'জবেন ভাই উইঠা পড়, এবারে যে মাঝদরিয়ায় ভাসতে হবে'। জবেন মিঞা চোখ খুললো, ঘন অন্ধকার আকাশে তারারা সব মিটমিট করে জ্বলছে। অর্থাৎ আকাশটা আজ পরিষ্কার থাকবে।

দক্ষিণ দিক থেকে বেশ একটা হাওয়া আসছে। মনে হচ্ছে যেন বসন্ত এসে গেছে। ট্রলার ভাসতে ভাসতে মাতলা নদী পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে পৌঁছে গেল।

তিন দিন পেরিয়ে গেল তবু সুবল জাল ফেলছে না। জবেন মিঞা তাই বললো, 'কী রে জাল বেছাবি কখন, বসে বসে যে মাজা ধইরা গেল'। সুবল এক বান্ডিল বিড়ি বার করে দিয়ে বলল, 'একটু সবুর করো'। রাতের আকাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সুবল মোহনার কাছে এসে দেখলো ভাটা শুরু হয়েছে।

জবেন মিঞাকে বললো, 'জাল বিছাতে হবে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে লে'। কালো অন্ধকারকে দূরে ফেলে কেবল মাত্র আন্দাজে আঁচ করে ফেলা হচ্ছে জাল। জাল বেছানো শেষ হয়ে গেলে ট্রলারের ওপর বসে এক দৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে আছে সুবল। আকাশ আস্তে আস্তে ফর্সা হচ্ছে। মেঘের কোল ঘেঁষে যেন সূর্যের আবির ছটায় অলস ঘুমের আলসেমি হাই তুলে ছাড়ছে পূর্ব দিকের আকাশ। জবেন মিঞা সবে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। সুবল চেঁচিয়ে বলল, 'মিঞাভাই জাল গোটাও মাছ ভালো পড়েছে, আকাশের অবস্থাও ভালো ঠাওর করতে পারসি না, কেমন মেঘ জমেছে'। জবেন মিঞা আকাশের দিকে তাকালো, ঝড় ওঠার তো তেমন পূর্বাভাষ নেই, তাহলে সুবল কেন এই কথা বলছে। যা হয় হোক অত শত না ভেবে জাল টানা যাক। জাল টানা যাচ্ছে না এত ভারি হাতে ঠেকছে। জবেন মিঞা ভাবলো কুমির-টুমির পড়লো না কি! একবার জালে কুমির আটকে তাদের ট্রলার ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল, সে অনেক বছরের আগের কথা। তাহলে আজ কি আবার... সুবল, জবেন মিঞার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সে অন্য কিছু ভাবছে তাই বললো, 'জবেন ভাই জাল গোটাও দেহি, মাছগুলো তো সব পেইলে যাবে, আকাশের দিকে চেয়ে অত কী ভাবো, ঝড় ওঠার আগে মাছগুলো তো ট্রলারে তুলতে হবে'। পারশে, ভেটকি, খয়রা, লোটা মাছ ট্রালারে ভর্তি হতে লাগলো। জবেন মিঞার খুশি আর ধরে না, এত মাছ দেখে তো সে অবাক। ট্রলার যখন প্রায় ভর্তি ঠিক তখন সুবল বললো, 'জবেন ভাই জাল গোটাও আকাশের অবস্থা ভালো বুঝছি না'। ট্রলার ক্যানিংয়ের উদ্দেশে রওনা হলো। খানিক এগোতেই ঝড় উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে শান্ত নদী তোলপাড় করতে লাগলো। ট্রলার যেন এই ডোবে তো সেই ডোবে। রেডিয়ো তারে সংকেত এলো বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত, সঙ্গে ট্রলার ভেড়ানোর নির্দেশ। সুবল ভাবলো মাছগুলো কি জলে ফেলে দেবে? কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব! একটা একটা করে ভারি জলের ড্রাম জলে ফেলা হলো, ট্রলার ডুবতে ডুবতেও ভেসে উঠলো। সে জবেন মিঞাকে বললো, 'ট্রলার বাঁচানোর একখান উপায় পাইসি, আমি ঝাঁপ দিই, তুমি মাছ আর ট্রলার নিয়ে ক্যানিংয়ে ফেরো।' জবেন মিঞা কাতর কণ্ঠে বললো, 'এ কি বলো সুবল, তুমি আমার ছোটো ভাই, মরলে দুজনে একসঙ্গে মরবো, আমি আল্লার কাছে কী জবাব দেবো, তার থেকে তুমি ভগবান ডাকোম আমি আল্লাকে ডাকি, দেখি আল্লা আমাদের রক্ষা করে কি না?' জবেন মিঞা উথাল পাতাল ঢেউ উপেক্ষা করে নামাজ পড়তে লাগলো।

সুবল কৃষ্ণনাম করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের মেঘ সরে গেল, দমকা হাওয়া বন্ধ হলো। ট্রলার ভিড়লো মাতলা নদীর চরে। ক্যানিংয়ের আড়তদাররা ছুটে এলো। নিলামে উঠলো মাছ বেশ ভালো দামে। জবেন মিঞা সুবলকে জড়িয়ে ধরলো, 'সুবল আমি সব মাছ ছাড়তে পারি, কিন্তু তুই কোনোদিন আমার থেকে আলাদা করিস না। ইত দিন ভাবতাম তুই ভাইয়ের মতো কিন্তু আজ ভাবলাম তুই যে আমার ভাই। আর তু মরে যাওয়ার কথা মুখে আনবি না'। সুবলের চোখেও তখন জল।



।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৩।।





বীরাঙ্গনা সিনগী দঈ

এক সময় আমাদের দেশে বনবাসীদেরও নিজস্ব রাজ্য ছিল, শাসন ব্যবস্থা ছিল এবং দুর্গ ছিল। একথা ইতিহাস স্বীকৃত। সাঁওতালদের রাজধানী ছিল চায় চম্পাগড়ে, মুণ্ডাদের সুতিয়াম্বেতে এবং ওরাঁওদের রোহতাস গড়ে। সেখান থেকেই তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

ভারতীয় শাসক বর্গের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষ এবং শাসন পরিচালনায় শৈথিল্যের কারণে বিদেশি আক্রমণকারীরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পেরেছিল। বনবাসী এলাকাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুঘল আমল থেকে বনবাসী এলাকা বিদেশিদের লক্ষ্যবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং বনবাসীরা বহুমুখী শোষণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে যায়।

মুঘল আমলে ওরাঁওদের রাজধানী ছিল বিহারের রোহতাসে। সেখানেই তারা দুর্গ স্থাপন করেন। তাদের প্রশাসকদের উরগণ ঠাকুর বলা হয়। সাসারাম থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের ওপর ছিল রোহতাসগড়। পাথরের তৈরি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এক সময় মুঘলদের দৃষ্টি পড়ল এই দুর্গের উপর। মুঘল সেনা দু'দুবার এই দুর্গ আক্রমণ করতে এসে পর্যুদস্ত হয়েছিল। ওরাঁও বীর যোদ্ধাদের কাছে হেরে গিয়ে মুঘলরা হীনবল হয়ে পড়েছিল।

সম্মুখ সমরে না পেরে মুঘলরা কৌশলের আশ্রয় নেয়। লুন্দরী গয়লানি দুর্গে দুধ বিক্রি করত যেত। মুঘলরা তাকে ভয় ও লাভ দেখিয়ে গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত করল। লুন্দরী মুঘল সেনাপতিকে জানাল যে, চৈত্রমাসে ওরাঁওরা সরহুল পর্ব উদ্‌যাপন করে। সেসময় তারা যুদ্ধ করে না। লুন্দরী দুর্গের গোপন প্রবেশপথের কথাও মুঘল সেনাপতিকে জানিয়ে দিল।

সুযোগ বুঝে মুঘলরা সরহুলের সময় দুর্গ আক্রমণ করল। ওরাঁও পুরুষরা হাড়িয়ার নেশায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিল। রাজকুমারী সিনগী দঈ তাঁর বান্ধবী কৈলী দঈয়ের সঙ্গে ধানভানার জন্য বাইরে এসেছিল। তারা দেখতে পেল মুঘল সৈন্যরা চুপিসারে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে। সিনগী দঈ তার বান্ধবীকে বলল দুর্গের সব মেয়েকে পুরুষ বেশে তির-ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্র সহ যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নিয়ে এস। খবর পাওয়া মাত্র



রাজকুমারীর নেতৃত্বে নারীবাহিনী মুঘল সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তির-ধনুক , বর্শা ও টাঙ্গির আঘাতে মুঘল সৈন্য পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে বাঁচল।

খবর পেয়ে মুঘল সেনাপতি রেগে লাল। লুন্দরীকে ডেকে এই পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞেস করল। লুন্দরী জানাল যে, যাদের ভয়ে মুঘল সেনারা প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তারা সকলে মহিলা। পুরুষরা হাড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকলেও মহিলারা সজাগ থাকে। তারাও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী।

রাজকুমারী সিনগী দঈয়ের নেতৃত্বে নারীবাহিনীর কাছে হেরে গিয়ে মুঘলরা বহুদিন রোহতাস গড় আক্রমণের সাহস পায়নি। পনেরো বছর পর সরহুলের সময় আবার মুঘলরা দুর্গ আক্রমণ করে। কিন্তু এবারও সিনগী দঈয়ের নেতৃত্বে রোহতাস গড়ের নারীবাহিনী মুঘল সৈন্যদের নাকাল করে ছেড়ে দেয়। মুঘল সেনাপতি বিশ্বাস করতে পারেনি যে, তারা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল তারা সবাই নারী। আবার লুন্দরীকে ডাকা হলো। লুন্দরী সেনাপতি ও কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে সোন নদীর তীরে লুকিয়ে থাকল। একটু পরেই দেখা গেল কয়েক হাজার ওরাঁও যোদ্ধা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দু'হাতে নদীর জল নিয়ে চোখে-মুখে দিচ্ছে। লুন্দরী বলল, দেখুন, পুরুষরা কখনো এভাবে মুখ ধোয় না। এরা পুরুষবেশী নারী যোদ্ধা। সেনাপতির মনোবল বেড়ে গেল। লুন্দরীও পুরস্কার নিয়ে চলে গেল।

পরের বছর সরহুলের সময় মুঘলরা ভালোভাবে তৈরি হয়ে রোহতাস আক্রমণ করল। সরহুল পরবের আনন্দে পুরুষরা নেশায় মত্ত ছিল। কিন্তু রাজকুমারী সিনগী দঈয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার ওরাঁও নারী তাদের পরম্পরাগত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়ল। সম্মুখ সমরে মুঘলরা পর্যুদস্ত হলেও লুন্দরীর দেখানো গোপন পথে ঝাঁকে ঝাঁকে মুঘল সৈন্য দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সিনগী সাহস না হারিয়ে তার এক বান্ধাবীকে শুকনো লংকায় আগুন ধরিয়ে দিতে বলল। লংকার ধোঁয়ায় মুঘল সৈন্য দিশেহারা হয়ে পড়ল। তখন সিনগী গোপন পথে বেশিরভাগ নারী সৈন্যকে বাইরে দিয়ে এল। মাতাল পুরুষদেরও বের করে আনা হলো। তবু বহু নারী-পুরুষ মুঘলদের হাতে ধরা পড়ল। মুঘল সেনারা তাদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার করল। ওরাঁও জনজাতির একজন মানুষও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করল না। রোহতাসগড়ে মুঘল প্রভুত্ব কায়েম হলো।

তারা রাঁচী ও আশেপাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করল। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতিতে আজও বারো বছর পর পর ওরাঁও মহিলারা 'জনী শিকার' উৎসবে মেতে ওঠে। সেই যুদ্ধের স্মরণে ওরাঁও মহিলারা কপাল ও কানপট্টিতে তিনটি রেখা অঙ্কন করে তিনটি যুদ্ধের স্মরণে। এই উৎসবে মহিলারা পুরুষ বেশ ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শিকার করতে বের হয়। সেদিন দলপতি মহিলা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন ওরাঁও রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজকুমারী সিনগী দঈ এবং তার বান্ধবী কৈলী দঈয়ের বীরত্বের কাহিনি।

শক্তিপদ ঠাকুর

ভারতের পথে পথে

নাসিক



মহারাষ্ট্রে গোদাবরী নদীর তীরে পশ্চিমঘাট পর্বতে ৬১০ মিটার উচ্চতায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন নগরী নাসিক। ভারতের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। পশ্চিম ভারতের কাশী বলা হয় এই শহরকে। গোদাবরীর অপর পারে পঞ্চবটী বন। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে এখানেই লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে পঞ্চবটী এবং আরও তিন কিলোমিটার দূরে তপোবন। এখানে রয়েছে সুন্দরনারায়ণের মন্দির, রামেশ্বর মন্দির, রামকুণ্ড, কপিলেশ্বর মহাদেব মন্দির, একটু দূরে কালারাম মন্দির, শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণকুটির, সীতাহরণ গুম্ফা, মুক্তিধাম মন্দির ইত্যাদি। এখানে বারো বছর অন্তর বসে কুম্ভমেলা। রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বর। রামনবমী ও মহাশিবরাত্রি নাসিকের অন্যতম উৎসব।

জানো কি?

ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধ্যেয়বাক্য

- ভারতের সংবিধান--- সত্যমেব জয়তে।
- সুপ্রিম কোর্ট— যতোধর্মস্ততো জয়ঃ।
- ভারতীয় বিমানবাহিনী— নভঃ স্পর্শং দীপ্তম্।
- ভারতীয় নৌবাহিনী--- শং নো বরুণঃ।
- জীবন বিমা নিগম— যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।
- অস্ত্রনির্মাণ সংস্থা--- বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
- দূরদর্শন—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

ভালো কথা

সেনা জওয়ানদের সম্মান

সেদিন ধুলিয়ান থেকে ট্রেনে আমরা মালদা ফিরছিলাম। ফরাক্কা স্টেশনে আমাদের কামরায় ছ'জন বিএসএফ উঠলেন। বসার জায়গা ছিল না, তাই আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি, ভাই আর পিসিমণি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে ওদের বসার জায়গা দিলাম। ওরা খুব খুশি হয়ে আমাদের নাম, কোন ক্লাসে পড়ি, বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়ি ফিরে দিদা বলল ওদের জায়গা ছেড়ে দিলি কেন? বললাম, স্কুলে বড়দিদিমণি বলেছিলেন উন্নত দেশগুলিতে সেনাবাহিনীর লোকেদের সেদেশের মানুষ নানাভাবে সম্মান জানায়। তাদের উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে, বাসে-ট্রেনে বসার জায়গা দেয়। ওদের জন্যই তো দেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে। বড়দিদিমণি বলেছিলেন আমাদের দেশেও এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ওদের সম্মান জানাতে পেরে সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

প্রতিমা কর্মকার, নবমশ্রেণী, কালিয়াচক, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

কাক

সায়ণ গিরি, দশম শ্রেণী, বি এস রোড, মালদা।

কা- কা- কা কেন ডাক ভাই
কা ছাড়া আর কোনো বুলি বুঝি নাই।
আমি গাই সা-রে-গা-মা
তুইও তাই গা না,
তোর বুঝি কা ছাড়া
নেই কিছু জানা!
কাকপাখি কাকপাখি দেখতে কি পাও?
চারিদিকে এত নোংরা তুলে নিয়ে যাও।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

নিঃসঙ্গ মানুষের আপনজন



অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইংরেজি সাহিত্যে এক বিখ্যাত উপন্যাসের অবসাদগ্রস্ত নায়িকা জানতে চেয়েছিল, 'এই পৃথিবীর আমাকে কী দরকার, আমারই বা এই পৃথিবীকে কী দরকার।' বরফ ঝরা সন্ধ্যায় বারন্দায় দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে ওই মহিলা বলেছিলেন, 'দোহাই ঈশ্বর, অন্তত একদিনের জন্য আপনি ক্যাথারিন বার্নেট হয়ে যান। তাহলেই বুঝতে পারবেন নিঃসঙ্গতা কাকে বলে।'

কলকাতার মণিকা মজুমদার ক্যাথারিন বার্নেটের নাম শোনেননি। কিন্তু এই শহরের অসংখ্য মানুষের মনের খবর তিনি রাখেন, যারা ক্যাথারিনের মতো অবসাদগ্রস্ত। এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ তাঁদের জট পাকানো অনুভূতিগুলো মণিকার কাছে মেলে ধরেন। সমস্যার গোড়ায় না পৌঁছতে পারলে সমাধান সম্ভব হয় না। মণিকা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করেন সমস্যার গোড়ায় পৌঁছতে। তারপর শুরু হয় চিকিৎসা। পেশায় মণিকা এনজিও কর্মী। তার এনজিও মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসায় একটি পরিচিত নাম।

লেখার সময় খুব সহজে লিখে ফেললেও একটি উদ্বাস্তু মেয়ের পক্ষে এরকম একটা পেশায় আসা খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে মেয়েটি যেখানে নিজেই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল। এই প্রসঙ্গে মণিকা বলেন, ' আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে এখানে আসি তখন আমার বয়স এক বছরেরও কম। আমার বাবা মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাজকর্ম করতে তো পারতেনই না, উপরন্তু কথায়-কথায় পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি বাধিয়ে বসতেন। আমার মা ছিলেন নির্মাণকর্মী। সামান্যই রোজগার করতেন। কিন্তু সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল।'

রিফিউজি কলোনির এক চিলতে ঘরের সেই নির্বান্ধব শৈশব কারও কাছেই কাম্য নয়। কিন্তু মণিকা নিরুপায়। কিছুদিন পর পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হলো। মণিকার মা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। 'ভাই'— এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যে অনেক রূপকথা লুকিয়ে থাকে। ভাইফোঁটা ও রাখিবন্ধনের মতো উৎসবে যে রূপকথা তার শ্রেষ্ঠ ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয়। কিন্তু মণিকার ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন নয়। তার মাকে বাইরের কাজ করতে যেতে হতো। বাবা অসুস্থ। তাই ভাইয়ের সব দায়িত্ব তাঁর উপরেই সে পড়ল। তখন তিনি ক্লাস সিক্সের ছাত্রী।

কয়েক বছর পর জীবন তাকে এক নতুন ধাঁধার মধ্যে এনে ফেলল। সতোরো বছর বয়সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়ে করতে হলো মণিকাকে। বিয়ের তেমন কোনো সুখস্মৃতি তাঁর নেই। মণিকা বলেন,'বেশ বড়ো পরিবারেই আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ওরা খুব রক্ষণশীল। প্রথম দিকে আমাকে বাইরের কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হতো না। সারাদিনটা একরকম একলাই কাটত। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, আমার কি নিজের কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে না? আমি কি মা-বাবা-ভাই বা শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব নিতে পারি না?'

সেইসব দিনগুলোতে মন খুব খারাপ থাকত। একটা অসম্পূর্ণতার অনুভূতি পেয়ে বসত মণিকাকে। একদিন আকস্মিকভাবে ছবিটা বদলে গেল। মণিকার স্বামী জানালেন এত বড়ো সংসার তিনি আর একা টানতে পারছেন না। হাতে যেন আকাশ পেয়ে গেলেন মণিকা। যোগাযোগ হলো একটি সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপের সঙ্গে। সমাজ সেবার সেই শুরু। আরও কয়েকটা বছর পর যোগাযোগ হলো অঞ্জলির সঙ্গে।

অঞ্জলি সেই সময় এমন কিছু মহিলাকে খুঁজছিল যারা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এবং যাদের মানসিক দিক থেকে অসুস্থ মানুষের সেবা করার আগ্রহ আছে। কিন্তু কাউন্সিলিং করতে গেলে ন্যূনতম কিছু শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োজন হয়। না, মণিকা পিছনে ফিরে তাকাননি। তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অঞ্জলির কর্মকর্তারা।

শুরু হলো নিঃসঙ্গ মানুষের আপনজন হয়ে ওঠার সাধনা। মণিকা বলেন,'আমরা দরজায় দরজায় ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলি। কিছুক্ষণ কথা বললে ঠিক কে মানসিক অবসাদে ভুগছেন বোঝা যায়। ওরা যখন দেখেন একজন অপরিচিত মহিলা বন্ধুর মতো কথা বলছেন তখন অনেকেই আরও বেশি করে নিজেদের মেলে ধরেন। তারপর প্রয়োজন মতো তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।'

এখন পর্যন্ত ২৭০০ জন মানুষের কাউন্সিলিং করেছেন মণিকা। তাদের মনের কাছাকাছি এসেছেন। আপনজন হয়ে উঠেছেন। এইসব করতে করতে নিজেও নিজের কাছে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সন্দেহ নেই, এই সম্পূর্ণতার অনুভূতিটাই তাঁর সব থেকে বড়ো পাওনা। ▌

জাতীয় সংহতির মূলকথা ভূমির সঙ্গে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক



স্বপন কুমার নাগ

বাংলায় যে অর্থে আমরা জাতীয় বলি, অবশিষ্ট ভারতে তাকেই রাষ্ট্রীয় বলা হয়। অর্থাৎ জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সমার্থক। রাষ্ট্রীয় সংহতিতে প্রথমেই আসে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে। (১) রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতে হবে। (২) নির্দিষ্ট অধিবাসী থাকতে হবে। (৩) একটি সরকার থাকতে হবে। এবং (৪) সার্বভৌমত্ব। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ গুণটির কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেননি, তা হলো রাষ্ট্রের একটি পরম্পরাগত সংস্কৃতি থাকতে হবে, যেটা সমগ্র রাষ্ট্রকে এক সুদৃঢ় বন্ধনে অখণ্ড করে রাখবে। অন্যথায় সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাই যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। যেমন হয়েছিল গর্বাচভের রাশিয়ার ক্ষেত্রে। হঠাৎ একদিন কোনও বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই সোভিয়েত রাষ্ট্রটা ছোটো ছোটো অনেকগুলি ভাগে ভেঙে গেল। অর্থাৎ উপরিউক্ত চারটে গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংহতি ছিল না। তাই 'রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি' ছাড়া রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্বই থাকে না, যতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটাকে একটা রাষ্ট্র বলা হোক না কেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে, সেখানকার লোকেদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চরিত্রে অর্থাৎ সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা অস্তিত্ব। আর এই চরিত্র অর্থাৎ সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয় এবং সকলেই এই সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত ভূখণ্ডটির সকল অধিবাসীই এই সংস্কৃতিতে থাকতে ভালোবাসে এবং এই সংস্কৃতিকে খুব আদরের সঙ্গে লালন পালন করে। তাই যে কোনও রাষ্ট্রই একটি সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন ভূমিখণ্ড। তবে আমেরিকার ক্ষেত্রে এই গুণটি এখনও প্রতীয়মান নয়। তাই বলা হয় America is still a melting pot and yet to develop a common ethos.

ব্যক্তির প্রকাশ যেমন তার ব্যক্তিত্বে, রাষ্ট্রের চরিত্রেরও প্রকাশ তার পরম্পরা অর্থাৎ সাংস্কৃতিক গুণাবলীর মধ্যে বা রাষ্ট্রীয়ত্বে। ভারতবর্ষের একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয়ত্ব রয়েছে এবং এই রাষ্ট্রীয়ত্বের ওপর সারা বিশ্বের শ্রদ্ধাবোধও রয়েছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা, শুধু তাই নয়, তা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হওয়া এবং সারা বিশ্বে সাড়ম্বরে তা পালিত হওয়া।

অতএব বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের গঠন শুধুমাত্র চারটি গুণাবলীর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে না, তারসঙ্গে একটা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির যোগ থাকে যেটা একে অপরের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমগ্র রাষ্ট্রটাকে একই সূত্রে বেঁধে রাখে। রাষ্ট্রের এই সংস্কৃতি অর্থাৎ পরম্পরাকে রাষ্ট্রের চেতনা বা চিতি বলা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রের 'প্রাণভোমরা' বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যেটাকে হত্যা করলে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ে। তাঁর দৃষ্টিতে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি হলো তার ব্যবসায়িক চেতনা ফ্রান্সের জন্য এটা তাদের স্বাধীনতা প্রিয়তা আর ভারতবর্ষের জন্য এটা আমাদের ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। আর এই হিন্দুধর্মই ভারতবর্ষের প্রাণভোমরা স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বর্তমানে ব্রাজিল বা চিলির চিতি তাদের ফুটবল প্রিয়তা।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা দেওয়া ওই চারটি গুণের মধ্যে সাময়িকভাবে একটা বা দুটো গুণ না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বটে কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিটি না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়। যেমন পূর্বতন দক্ষিণ আফ্রিকা বা যুগোশ্লোভিয়া। একইরকমভাবে ১৯৪৭ সালের আগে ভারতের সার্বভৌমত্ব বা সরকার না থাকলেও, ভারতবর্ষ যথার্থ রাষ্ট্র রূপে বিরাজমান। আর সেই কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'A nation in making' কথাটা একদমই ঠিক নয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা সকল সভ্যতার মধ্যে আদি সভ্যতা এবং সকল সভ্যতার মাতৃস্বরূপা। একইরকম ভাবে মহাত্মা গান্ধীকে Father of the nation বলাটাও ভুল। কারণ গান্ধীজীর জন্মের পূর্বেও ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকার Father of the nation বলা হয়। এবং সত্যি সত্যি তিনি বর্তমান আমেরিকার পিতৃস্বরূপ। তাকেই অনুকরণ করে গান্ধীজীর ওই শিরোপা।

১৯৪৮-এর পূর্বে নিজস্ব ভূমি না থাকা সত্ত্বেও বাকি গুণগুলির কারণে ইজরায়েল একটি রাষ্ট্র ছিল। বর্তমানে তিব্বত চীন বলপূর্বক অধিগ্রহণ করলেও, তিব্বতের জাতীয় সরকার ভারতবর্ষের ধর্মশালা থেকে (A Government in exile) সক্রিয়। এবং পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো রাষ্ট্র দলাইলামা সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রের গঠনটি মোটামুটি ভাবে ভৌতবিজ্ঞানের মৌলিক পদার্থের সঙ্গে তুলনীয়। মৌলিক পদার্থের গুণ যেমন তার ক্ষুদ্রতম সকল কণা অর্থাৎ অণুর মধ্যে বিদ্যমান, তেমনই রাষ্ট্রের সকল সাংস্কৃতিক গুণাবলী রাষ্ট্রের সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই রাষ্ট্রের এই মূল গুণগুলিই জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের এই সংস্কৃতি বা স্বকীয়তা একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়ত্ব। এই স্বকীয়তা বা সংস্কৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য আলাদা আলাদা। আর এই স্বকীয়তা সকল মানুষের মনে প্রকাশ্য বা সুপ্তভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবহমান। এই পদ্ধতিকেই রাষ্ট্রের পরম্পরা বলা হয়। রাষ্ট্রের এই গুণগুলিই জাতীয় সংহতির মূল উপাদান। এই গুণগুলির প্রতি সকল নাগরিকের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রদানই জাতীয় সংহতির মূলমন্ত্র। তাই রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জাগরণই জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করে তুলবে। এই শ্রদ্ধাবিন্দুর অন্য নাম রাষ্ট্রের মানবিন্দু (Prestige Point)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা অনুযায়ী মানুষ হলো সেই ব্যক্তি যার মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে। ব্যক্তির মানবিন্দু যেমন তার কান বা জামার কলার, অর্থাৎ কেউ আমাদের কানমুলে দিলে বা জামার কলার ধরলে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি। তেমনই রাষ্ট্রের মানবিন্দু হলো, রাষ্ট্রের ভূমিখণ্ড, জাতীয় পতাকা ইত্যাদি। একই রকমভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক মানবিন্দু হলো রামজন্মভূমি, কৃষ্ণজন্মভূমি ইত্যাদি। আর এই রাষ্ট্রীয় মানবিন্দুগুলোকে রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতাই আমাদের জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই মানবিন্দুগুলির মান্যতা কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এর মান্যতা আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারতবাসীর এমনকী যারা বিশ্বের সকল হিন্দুদের মনে রয়েছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির স্বরূপ একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাবে। তা হলো ভারতবর্ষ যেন একটা ফুটির (ফল) মতো। বাহিরে অনেকগুলো দাগের মাধ্যমে অনেকগুলো ভাগ তৈরি হয় এবং মনে হয় যেন একটা ভাগ অন্যভাগ থেকে পৃথক। কিন্তু কাটলে দেখা যায় সমস্ত ফলটাই একটা একক, ভিতরে কোনো বিভাজনই নেই। একইরকমভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বহিরঙ্গের বিভিন্নতা বর্তমান। তা আলাদা আলাদা, ভাষা, পোশাক-আশাক, আচারবিচার, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু অন্তরে সকল ভারতবাসী এক। তাইতো কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগর মেলায় সকল ভারতবাসীর আগমন এবং সেখানে সবাই মিলেমিশে একাকার। কবির ভাষায় 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'।

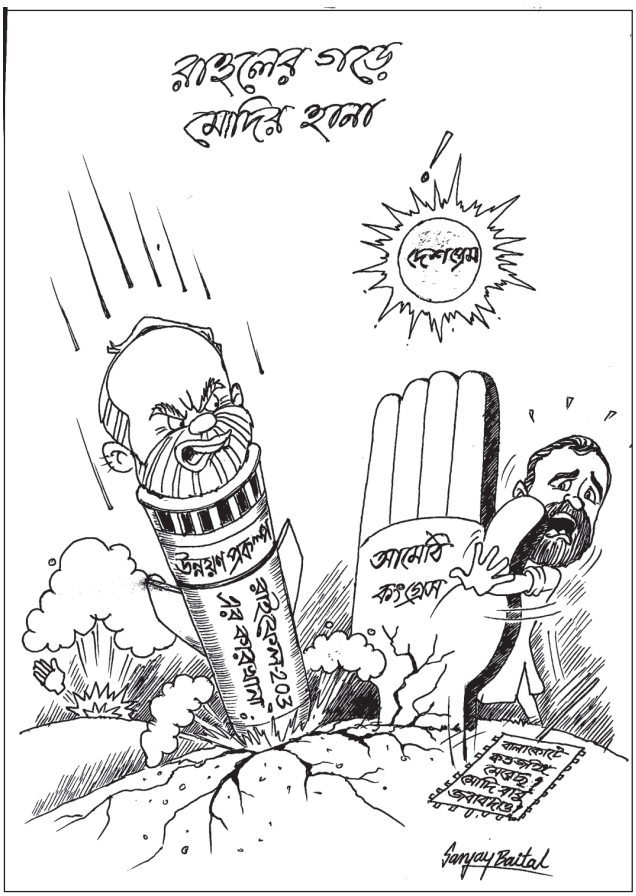
অপরদিকে পূর্বতন রাশিয়াকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো ঠিক যেন কমলালেবু। কিন্তু বাইরের আবরণটা যখন খুলে পড়ে তখন সবকটা কোয়ার আলাদা আলাদা অস্তিত্ব দেখা যায়। বাইরের আবরণটা যে কোনও একটি বিষয় হতে পারে, যেমন শক্ত প্রশাসন, অর্থনৈতিক অবস্থা বা সামরিক শাসন ইত্যাদি। যে মুহূর্তে বাইরের খোলসটা খুলে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক বিভিন্নতার প্রকাশ ঘটে। যেমন সোভিয়েত রাশিয়া বা ১৯৭১-এর পর পাকিস্তান অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্য। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর ভারতবর্ষের তো এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। কারণ ভারতের অন্তরটা তো একটাই একক তা হলে হলো কেন? ভারতবর্ষ ত্রিধাবিভক্ত কেন? কারণ আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রবোধ সম্বন্ধে বিস্মরণ। রাষ্ট্রকে রক্ষা করলে তবেই আমরা রক্ষিত হব। না করলে ধ্বংস হব। যেমন পূর্ববাংলা কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা রক্ষিত হলাম না। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে নিজভূমে পরবাসী হয়ে গেলাম।

তাই ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষা করাই জাতীয় সংহতির মূলমন্ত্র। যখনই এর স্খলন ঘটে তখনই আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হয় ''এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেব আমি''। এই ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা যে যে অঞ্চলে বিদ্যমান, সেটাই আমাদের সাধের ভারতরাষ্ট্র। তা বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত বাহান্ন পীঠের এক পীঠ মরুতীর্থ হিংলাজই হোক আর বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরই হোক। সেটাই আমাদের অখণ্ড ভারতের চিন্তা বা ভারতবর্ষের সম্যক সংহতি। ভারতভূমির সঙ্গে ভারতবাসীর মাতা-পুত্রের সম্পর্ক। এর মধ্যে কোনও সামরিক অভিযানের গল্প নেই বা ছল, বল, কৌশলের কোনও খেলা নেই। তাই রাষ্ট্রীয় সংহতির মূল কথা হলো রাষ্ট্রের পাঁচটা গুণের প্রতি সকল নাগরিকের অখণ্ড আনুগত্য প্রকাশ। এর কোনও বিকল্প নেই।

রম্যরচনা

একটি মার্কিন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা একটি উন্নতমানের রোবট আবিষ্কার করেছে। রোবটটির বৈশিষ্ট্য এই যে, কেউ মিথ্যে কথা বললেই রোবটটি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। রোবটটি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য ওই মার্কিন কোম্পানি ঠিক করল, সব রাজনৈতিক নেতাদের সভায় তারা রোবটটিকে হাজির করবে। সেই মতো রোবটটিকে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হলো রাহুল গান্ধীর সভায়। রাহুল গান্ধী তখন সভায় সবে মাত্র ভাষণ শুরু করেছেন। বলছেন— 'আমি পৈতেধারী দত্তাত্রেয় গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। আমি রোজ শিবপূজা করি...' এইটুকু বলা মাত্রই রোবট সোজা গটগটিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠল। তারপর ঠাস করে রাহুল গান্ধীর গালে একটি চড় মেরে বসল। এরপর রোবটটিকে আনা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়। মমতা তখন তার ভাষণে বলছিলেন— 'আমি সততার প্রতীক। টালির চালার ঘরে থাকি। হাওয়াই চটি পরি। আমার নিজের কিছুই নেই। সবই মা-মাটি- মানুষের...'।

এতকিছু শুনেও রোবট কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা রোবটকে নেড়েচেড়ে দেখতে গেলেন। দেখা গেল, মমতার ভাষণ শুনে রোবট অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।



উবাচ



"রাফাল থাকলে এপারের কাউকে ওপারে যেতে হতো না। আর প্রতিপক্ষেরও কেউ বাঁচত না।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

গুজরাটের জামনগরে এক জনসভায় বক্তব্যে



"শারীরিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেই আবার যুদ্ধবিমান চালাতে পারবেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান।"

বি.এস. ধানোয়া
ভারতের এয়ার চিফ মার্শাল

কোয়েম্বাটোরে সাংবাদিক সম্মেলনে



"ভারতের উচিত ছিল আরও আগে এয়ার স্ট্রাইক করা।"

রহমতুল্লাহ নবিল
ইরানের গুপ্তচর সংস্থার প্রধান

প্রতিবেশী দেশে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ায় পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি



"আগের সরকার ওয়ান র‍্যাঙ্ক-ওয়ান পেনশনের জন্য ৫০০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছিল। এনডিএ সরকার গত তিন বছরে ৩৫০০০ কোটি টাকা সৈনিকদের খাতায় ট্রান্সফার করেছে।"

নির্মলা সীতারামন
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

জওয়ানদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে



"কলকাতা পুলিশের যেসব অফিসার তিন বছর ধরে একই পদে রয়েছেন, তাদের সরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার ব্যাকডোর দিয়ে তাদের আবার ফিরিয়ে আনছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হোক।"

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রা প্রসঙ্গে

বায়ুসেনার আক্রমণে ধ্বংস জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বি.এস. ধানোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশে যখন বিরোধীদের তরজা চলছে, মমতা থেকে মেহবুবা, দিগ্বিজয় থেকে কেজরিওয়াল—সবাই প্রমাণ চাইছেন, ঠিক তখনই এয়ার চিফ মার্শাল বি.এস. ধানোয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বায়ুসেনা ব্যর্থ হয়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে। তবে বায়ুসেনার আক্রমণে কতজন জঙ্গি মারা গেছে যে ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার চিফ মার্শাল বলেন, 'কতজন মারা গেছে সেটা বায়ুসেনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সরকার সেটা বলবে। মৃতদেহ গোনা আমাদের কাজ নয়। আমরা শুধু দেখি যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা পূরণ করতে পারা গেল কিনা।' তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জানতে চান, যদি এয়ার স্ট্রাইক না হয়ে



থাকে তা হলে পাকিস্তান প্রতি-আক্রমণ করল কেন?

পাকিস্তানের এফ-১৬-কে প্রতিহত করতে ভারত মিগ-২১ বিসন পর্যায়ের বিমান ব্যবহার করেছে বলে সারা দেশে যে সমালোচনা হচ্ছে তারও জবাব দেন এয়ার চিফ মার্শাল। তিনি বলেন বিমান হানার সময় অনেক ভেবেচিন্তে বিমান বাছা হয়। কিন্তু যখন শত্রুদেশ প্রতি আক্রমণ করে তখন কার্যক্ষম যে কোনও বিমানকেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান, মিগ-২১ বিসন এখন অনেক উন্নত বিমান। তিনি বলেন, 'মিগকে আগের থেকে আরও উন্নত করা হয়েছে। এখন মিগের রাডার, আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপ করার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত।'

পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমান সম্বন্ধে এয়ারমার্শাল বলেন, 'অভিনন্দন এখনই আবার বিমান চালাবে কিনা তা নির্ভর করছে তার শারীরিক অবস্থার ওপর। এই জন্যেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শারীরিক দিক থেকে পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার পর ওকে আমরা বিমানের ককপিটে দেখতে পাব।'

আজাদ বালুচিস্তান জিন্দাবাদ

বালুচ রিপাবলিকান আর্মির আক্রমণে কোণঠাসা পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলায় প্রবাদ আছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। কথাটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে পাকিস্তান। সম্প্রতি বালুচ রিপাবলিকান আর্মির আক্রমণে বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে পাকিস্তান। কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টি করে ভারতের ক্ষতি করার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে সন্ত্রাসবাদী দেশটি। বালুচ রিপাবলিকান আর্মির তরফে যে ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে জানা গেছে, বালুচ আক্রমণে পাকিস্তানের তিনটি সেনাছাউনি ধ্বংস হয়েছে। শোনা গেছে শ্লোগান, 'আজাদ বালুচিস্তান জিন্দাবাদ।'



প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বালুচিস্তান পাকিস্তানেরই একটি অঙ্গরাজ্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই আজাদ বালুচিস্তানের দাবিতে লড়াই করা বালুচদের ওপর পাকিস্তানি সেনা বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে। অভিযোগ, কুড়ি হাজার বালুচ মহিলা এবং শিশুকে পাকসেনা যুদ্ধবন্দি করে রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এদের মধ্যে অনেকেই ধর্ষিত এবং নিহত।

পাকিস্তানের কাছে বালুচিস্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে আছে তেল এবং সোনার খনি। তার থেকেও বড়ো কথা বালুচিস্তানের সীমা পেরোলেই ওদিকে আফগানিস্তান এবং ইরান। পাকিস্তানের সব থেকে বড়ো রাজ্য হলেও, আয়তনের তুলনায় এখানে লোকবসতি কম। ৫৬ বিলিয়ন ডলারের চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরেরও অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বালুচিস্তান। সুতরাং বালুচিস্তানের গুরুত্ব খাটো করে দেখার উপায় নেই।

পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার পর আমেরিকা কেন্দ্রিক বালুচ সংগঠন বালুচিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস (বিএনসি) জইশ-ই-মহম্মদের এই বর্বরোচিত কাজের তীব্র নিন্দা করেছিল। শুধু তাই নয়, অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ভারতকে অনুরোধ করেছিল বিএনসি। অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যাবতীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়েছিল সংগঠনটি। বিএনসি-র প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ বালুচ এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে যে পাকিস্তান আছে সে ব্যাপারে কারোও কোনও সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন, 'নিরীহ মানুষকে হত্যা করার দাম পাকিস্তানকে দিতেই হবে।'

আমেথিতে ভারত-রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে রাইফেল নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের আমেথির কওহর সফর করেন। তিনি সেখানে কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল উৎপাদনের জন্য ভারত-রাশিয়া রাইফেল্স প্রাইভেট লিমিটেড নামক যৌথ উদ্যোগ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। আমেথিতে শ্রী মোদী একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি পুতিন যে বার্তা পাঠিয়েছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তা পাঠ করে শোনান। তাঁর বার্তায় শ্রী পুতিন বলেছেন, ''রাশিয়া-ভারত নতুন এই যৌথ উদ্যোগের ফলে সর্বাধুনিক ২০০ সিরিজের বিশ্বখ্যাত কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল তৈরি হবে। ঘটনা প্রবাহে স্থানীয় ভিত্তিতেই এর উৎপাদন হতে চলেছে। এই উদ্যোগের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে, রাশিয়ার আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে ছোটো মাপের অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হবে।'' সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী, এই যৌথ উদ্যোগের জন্য রাষ্ট্রপতি পুতিনকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, আমেথির এই কারখানা থেকে লক্ষ লক্ষ রাইফেল তৈরি হবে যা দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে আরও শক্তিশালী করবে।



সেনাকে অবিশ্বাস আর সন্ত্রাসে প্ররোচনা একই বিষয় : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে ভাষণ দেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্পর্কে 'ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ' সচেতন করার ব্যাপারে যে প্রয়াস নিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদকালের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, জাতীয় স্তরে তাঁর স্বল্প অভিজ্ঞতাই অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। দেশের বৈদেশিক নীতি প্রসঙ্গে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েকদিনের ঘটনাসমূহ, এই নীতি নিয়ে যে সন্দেহ রয়েছে তা নিরসনে সাহায্য করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আজকের ভারত এক নতুন ভারত এবং এক ভিন্ন ভারত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সেনার জীবন অমূল্য এবং আজ ভারতের সঙ্গে কেউই বিশৃঙ্খলা তৈরির সাহস দেখাতে পারে না। জাতীয় স্বার্থে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও শ্রী মোদী অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ভেতরে এবং বাইরে কিছু নেতিবাচক শক্তি রয়েছে, যারা দেশের বিরুদ্ধে ভারতের এই একতা দেখে ভীত। তিনি বলেন, এই ভীতি একদিকে দেশের পক্ষে ভালোই। ভারতের শৌর্য দেখে শত্রুরা ভীত, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা আইনের কারণে ভীত, পক্ষান্তরে এই ভীতি মঙ্গলজনক। তিনি আরও বলেন, নতুন ভারত তার সক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনীগুলির সদিচ্ছা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, তাদের মানসিকতার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন। শ্রী মোদী বলেন, নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে আসলে তারা দেশের বিরোধিতা করছেন। এই বিরোধিতা দেশের ক্ষতি করছে। তাঁর অভিমত, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলির প্রতি যারা সন্দেহ প্রকাশ করেন তারা যারা দেশে সন্ত্রাসে প্ররোচনা দেন, তাদেরই সমর্থন করেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি বলেন, ভারত রাফাল যুদ্ধ বিমানের অভাব সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেশি অনুভব করেছে। এমনকী, এই যুদ্ধ বিমান সংগ্রহ নিয়ে অনেক রাজনৈতিক খেলাও হয়েছে। যাদের কিছু পদক্ষেপ জাতীয় নিরাপত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের কড়া সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বহু বছর ধরেই যারা দেশ শাসন করেছেন, তাদের দুটি বিষয়ের ওপর আগ্রহ ছিল। এগুলি হলো— দান-খয়রাতি ও চুক্তি। এর ফলে, সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের জওয়ান ও কৃষকরা। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ, হাতে গোনা কয়েকজন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ, চুক্তির পেছনে সঠিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। রাজনৈতিক স্বার্থেই দান-খয়রাতি করা হয়েছে যাতে দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যান এবং তাদের কাছে দয়ার পাত্র হয়ে থাকেন। এর সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কৃষি ঋণ মকুব। তাঁর সরকার যে 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' চালু করেছে, তার উদ্দেশ্যই হলো কৃষক সমাজের ক্ষমতায়ন। ঘোষণার ২৪ দিনের মধ্যেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে বলেও শ্রী মোদী উল্লেখ করেন।

শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকারের ৫৫ মাস এবং অন্যান্যদের ৫৫ বছর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুই ভিন্নধর্মী প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটায়। তিনি বলেন, 'তাদের প্রয়াস ছিল প্রতীকি', আর 'আমাদের প্রয়াস সামগ্রিক'। এ প্রসঙ্গে তিনি সেনানীদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন'; 'গরিব মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ'; পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি 'উজ্জ্বলা যোজনা'; 'সকলের জন্য বিদ্যুৎ' এবং 'সকলের জন্য আবাসন' কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, ভারত কেন এখনও প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ওঠেনি! বহু দশক পেরিয়ে গেলেও কেন যুদ্ধ স্মারক বা পুলিশ স্মারক গড়ে তোলা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ভারত এখন দ্রুত বিকাশশীল বৃহৎ অর্থনীতি। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

গিনেস বুকে তিনটি রেকর্ড করে শেষ হলো কুম্ভমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঊনপঞ্চাশ দিন ব্যাপী কুম্ভমেলা এযাবৎ সর্বাধিক চব্বিশ কোটি মানুষের যোগদানে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করল। সমাপ্তির দিন সোমবার মহাশিবরাত্রির মুহূর্তে সঙ্গমে পুণ্য স্নান করলেন ১ কোটির অধিক পুণ্যার্থী। প্রসঙ্গত স্নান শুরু হয়েছিল গত জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে। প্রয়াগরাজ মেলা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের সর্বাধিক ৭৬০০ লোক মাত্র আট ঘণ্টার ভেতর হাতে ছাপানো পেন্টিং করে গিনেস বুকে নাম তোলেন।

সঙ্গম স্থলকে কেন্দ্র করে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই দিনে ১০ হাজার পুণ্যার্থী পুণ্য ডুব দেন। তাঁদের ৩.২ কিলোমিটার পথের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে পৌঁছে দিতে পথে নেমেছিল অত কম দূরত্বে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যার বাস, সংখ্যায় ৫০৩টি।

মেলা পরিচালকদের বয়ান অনুযায়ী স্নানার্থীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশই তিনটি পবিত্রতম দিন (১) ১৫.১.১৯ মকর সংক্রান্তিতে ২.২৫ কোটি, (২) ৪.২.১৯-এ মৌলি অমাবস্যায় ৫.৫ কোটি, (৩) ২০.২.১৯-এ রযন্ত পঞ্চমীর দিন ২ কোটি মানুষ বিখ্যাত শাহী স্নানে অংশ নেন।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে ৫ মার্চ এই বিশ্ব কীর্তি স্থাপনকারী এই মানব মিলনমেলায় সমাপ্তি নেমে আসে।



সুশীল সমাজের মাতব্বররা উকিল প্রশান্তভূষণের পেছনে দাঁড়ালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত ছুতো নাতায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে আদালতের মূল্যবান সময় অপচয়ের কারণে সদা সক্রিয় উকিল প্রশান্তভূষণের ওপর আদালত অবমাননার মতো সঙ্গীন অভিযোগ করেছে। বিশেষ করে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সিবিআই-এর অন্তর্বর্তী নির্দেশক নিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগকে সরাসরি মিথ্যে, কু-উদ্দেশ্যপূর্ণ, অসৎ ও হঠকারী বলে আখ্যা দিয়ে আদালত উল্লেখিত চরম অবস্থান নেয়।

শ্রীভূষণ যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী-– যারা বর্তমান সরকারের সব ধরনের কাজেরই বিরোধিতায় অভ্যস্থ সেই তথাকথিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন একথা সর্বজনবিদিত। এই মামলায় এমনই দশজন ভূষণ হিতৈষী তাঁকে মদত দিতে নেমেছেন। সোনিয়া গান্ধীর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পূর্বতন হর্তাকর্তা শ্রীমতী অরুণা রায়, যে কোনো উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনে মদতকারী উগ্রপন্থী লেখিকা অরুন্ধতী রায়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বামপন্থী অধ্যাপক বাহিনীর জয়তী ঘোষ, শিবাজী পট্টনায়ক। এদের সঙ্গে রয়েছেন ঘোর বিজেপি বিরোধী আরও জনা ছয়েক সুশীল সমাজের অংশীদার।

মজার কথা এই প্রকাশ্য দশ জন ভূষণ মদতকারীর বিভিন্ন সময়ের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে জড়িয়ে যাওয়ার মামলায় ভূষণই আদালতে তাঁদের হয়ে ওকালতি করে থাকেন। আজ দলের এক কেষ্ট বিষ্টু ফেঁসে যাওয়ায় সংহতি জানাতে তারা মরিয়া হয়ে পড়েছেন। আদালতকে তাঁদেরও উল্লেখিত মামলায় বিবাদীপক্ষ হিসেবে গণ্য করার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। মামলার পরিণতিতে যে রায় দেওয়া হবে তাঁরাও তার ফলভোগী হতে চেয়েছেন। তাঁদের আইনজীবী কামিনী জয়সোয়ালের মাধ্যমে দাখিল করা এক যৌথ আবেদনপত্রের সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

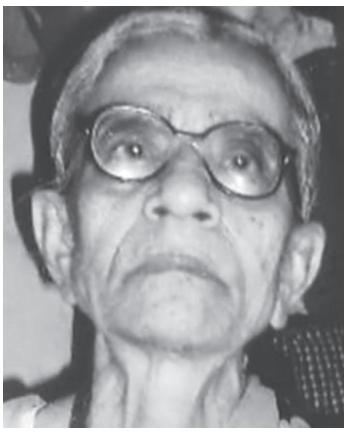
মামলাকারী ও উকিলদের ওপর আদালতের তরফে কোনো রকমের বাধা নিষেধ আরোপ করলে বিশেষ করে যে সমস্ত মামলা জনস্বার্থ সংক্রান্ত (তাঁদের বিচারে) নাগরিকদের বাক্‌স্বাধীনতা ভয়ংকরভাবে লঙ্ঘিত হবে। বাক্‌স্বাধীনতার ওপর এই ধরনের হস্তক্ষেপে শুধু যে মামলাকারী বা উকিলদের স্বাধীনতাই ক্ষুণ্ণ হবে তা নয়, সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ ও তার অংশীদার সুশীল সমাজের স্বাধীন মতামতের ওপরও খড়্গ নেমে আসবে বলে তাঁরা আবেদনে অশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

একা রামে রক্ষা না হয়ে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অধুনা বিজেপি বিদ্বেষী পূর্বতন সাংবাদিক অরুণ শৌরি, বামবাদী সম্পাদক এন রাম বা উগ্রপন্থা সমর্থক শ্রীমতী মৃণাল পাণ্ডেও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে একটি পৃথক আর্জিতে আদালতে একই আবেদন করেছেন। তাঁদের স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মের আইনি মদতদাতাকে বাঁচাতে তাঁরা আজ এককাট্টা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও পূর্বতন প্রচারক প্রফুল্লকুমার সেনের মাতৃদেবী বীণাপাণি সেন গত ৩ ফেব্রুয়ারি সকালে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার চাঁচল নগরের স্বয়ংসেবক সুকুমার দে-র মাতৃদেবী



নন্দরানি দে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক পূর্বতন মহকুমা কার্যবাহ এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সঙ্ঘের পূর্বতন জেলা সম্পাদক সত্যগোপাল ধুয়া গত ২৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া জেলার পূর্বতন সভাপতি ভবানীশঙ্কর দে গত ১ ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার পুরাতন মালদহ



খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ তথা বদ্রীনারায়ণ দাস সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য সুরজিৎ দাসের পিতৃদেব ছেদী দাস গত ৭ ফেব্রুয়ারি সাহাপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২১ ফেব্রুয়ারি হিজলী হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক (বর্তমানে কলকাতা নিবাসী) অচিন্ত্য কুণ্ডু তাঁর একমাত্র পুত্র অনির্বাণের বিবাহ উপলক্ষ্যে পুত্রবধূর হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ড. বিজয় আঢ্যের হাতে। অনুষ্ঠানে ড. তিলক রঞ্জন বেরা, রাজকুমার ঝা সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

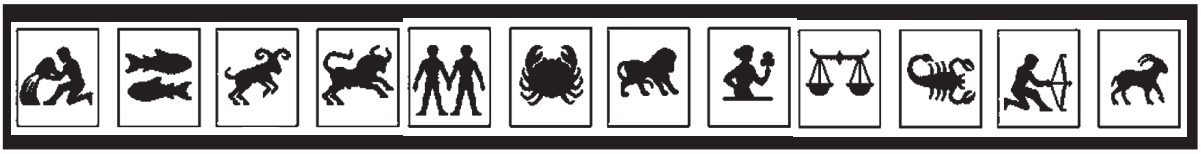
১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৫. সম্পাদকের নাম : রন্তিদেব সেনগুপ্ত। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** মানিকতলা গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেট, ব্লক-আই, ফ্ল্যাট-৮, ভি আই পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪। **মালিকানা :** ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।
ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :
শ্রী মোহনলাল পারীখ, পারীখ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, বি কে মার্কেট, ১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১।
শ্রী অশোক মোদী, ১, লর্ড সিন্‌হা রোড, ফ্ল্যাট-৫এ, অঙ্কুর, কলকাতা-৭০০০৭১।
শ্রী নীলোৎপল মজুমদার, ৩/১১, বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২।
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৪।

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

তারিখ ঃ ১১.০৩.২০১৯

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



১১ মার্চ (সোমবার) থেকে ১৭ মার্চ (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে মঙ্গল, কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে শুক্র কেতু, কুম্ভে রবি, মীনে বক্রী বুধ। শনিবার সন্ধ্যা ৬-১৪ মিনিটে রবির মীনে প্রবেশ। পুনশ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে পশ্চাদ্‌গামী হয়ে বুধের কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী নক্ষত্র থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ স্বজন বাৎসল্য, গৃহ, সম্পত্তি, পুত্র ও রমণীর সান্নিধ্যলাভ। পক্ষপাতহীন বিচারশীল, অবিশ্বাসী, অধ্যয়নে রুচি, বাক্‌চাতুর্যে মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। কর্মসংস্থান বিষয়ে সুহৃদ সহযোগিতা এবং স্বাধীন পেশায় নিযুক্তদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। ন্যায়াধিক্যের চাপ বর্তমান থাকবে।

বৃষ ঃ সাংসারিক সুখ, গৃহ-বাহন সমাজে সদ্ভাব বৃদ্ধি। একাধিক ধনাগমের পন্থা ও মিত্র লাভ। বিভাগীয় প্রধান, বিচারক, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাস্কর্যের পূজারীদের কর্মজনিত যশ ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী, সন্তান, সন্ততির পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতি। সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি। বিদেশি ও আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় প্রাপ্তি শুভ।

মিথুন ঃ সহোদর ভ্রাতা ভগ্নির পদোন্নতি ও কর্তৃপক্ষের শংসা লাভ। প্রিয়বাক্য এবং সেবার মনোভাবে কর্মক্ষেত্রে বিজাতীয় সংস্পর্শে উন্নতির সুযোগ। কর্মলাভ ও ব্যবসায় ইতিবাচক পদক্ষেপ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে মানসিক অস্থিরতা, সন্তানের জেদ আত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্যে উদ্বেগ।

কর্কট ঃ ভ্রাতা-ভগ্নির শারীরিক অসুস্থতা, জমিজমা ও হিসাবের গরমিল, গুপ্ত শত্রুতায় উদ্বেগ-অশান্তি। ক্রোধ চপলতায় জীবিকা ক্ষেত্রে সমালোচনা ও অনিশ্চয়তা যোগ। সপ্তাহের শেষপাদে জীবনসাথীর বুদ্ধিমত্তায় হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সূচনা। প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাগমন।

সিংহ ঃ বস্ত্র, অলংকার, পুত্র, পত্নী লাভ। ব্যবসা-পেশায় প্রগতি ও আর্থিক প্রাচুর্য, সমাজকল্যাণে ভরপুর আনন্দ। রমণীর সাহচর্যে কার্যে সাফল্য। কর্মপ্রার্থীদের ঝুলে থাকা বিষয়ের অবসান। বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সফল মনস্কাম।

কন্যা ঃ মহিলা ও আত্মীয় দ্বারা ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। সুন্দর শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে সাংগঠনিক সাফল্য। সাহিত্য পিপাসু ও গবেষকদের প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ ও দেবী কৃপা লাভ। একাধিক ব্যবসা করার সফল প্রয়াস।

তুলা ঃ সুমধুর বাক্য প্রয়োগে প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বিরোধিতা হ্রাস, জীবনসাথীর সঙ্গে মনান্তর। কর্মক্ষেত্রে হাস্যময়ী রমণীর প্রভাবে কর্তৃপক্ষের বিরূপতা। বুদ্ধিমত্তায় গৃহ, সম্পত্তি লাভ। অগ্রজের ভাগ্যোন্নতির পথ প্রশস্ত। জ্বর, সায়টিকা ও অনিদ্রায় উদ্বেগ। কোনো ঘনিষ্ঠের দ্বারা প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক ঃ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিষ্টাচার, সৌজন্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠান। দর্শন, বেদান্ত, গণিতজ্ঞ, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতে সৌজন্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি। শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার, সুবক্তা, সাংবাদিক প্রযুক্তিবিদ, সার্ভেয়ার, আইনজ্ঞের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অংশীদারী ব্যবসা ও লিখিত চুক্তি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু ঃ বাহন, মিত্র যোগে গৃহ ও মাতৃসুখ। প্রজ্ঞা, অহমিকাহীন ভাবে স্বীয় ব্যক্তিত্বে রিসার্চ স্কলার, চাটার্ড, প্রযুক্তিবিদের সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। বিবাহিতের সুখ-সমৃদ্ধি, কর্মপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বৃদ্ধি। সম্পত্তি বিক্রয়ে প্রাপ্তি তবে আইন ও পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন।

মকর ঃ আর্থিক অসুবিধা, ক্রোধ, দুঃখ, অসুস্থতা, সন্তানের বিপদ, কর্মে অনীহায় সপ্তাহ অতিবাহিত হবে। গবাদি পশু, চর্ম, তরল ও জলজ ব্যবসায় জীবনের ঝরাপাতায় নব-বসন্তের সম্ভাবনা। কাজের প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হবে। তবে নিকট ভ্রমণে মানসিক প্রশান্তি।

কুম্ভ ঃ সহোদরের উন্নতি, গৃহশ্রীর সৌজন্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পারিবারিক সুস্থিতি। কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা ও সখ্যতা বৃদ্ধি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সন্তান লাভ, নতুন বাহন যোগ, বিদ্যার্থীর উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। দালালি,প্রমোটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, জীবন বিমা ব্যবসায় অর্থ-বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা। সপ্তাহের প্রান্তভাগে পুরাতন বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ।

মীন ঃ শৌখিন দ্রব্য, বস্ত্র, অলংকার, ঔষধ, পুস্তক, ইলেকট্রনিক ব্যবসায় প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। মধ্যবিত্তদের আবাসন বা গৃহ লাভ। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শংসা ও কর্মপ্রার্থীদের নতুন কর্মলাভ, সন্তান, সন্ততির পড়াশুনায় অমনোযোগিতা। বিবাহ প্রার্থীদের বিবাহ সম্পন্ন। হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার যোগ। ব্যায়াধিক্যের চাপ কমবে।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য